বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম্-এ, বি-এস্সি, বি-কম্,
এ-এস্-এ-এ (লণ্ডন), আর্-এ

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্‌ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩।৮ জন্‌সন রোড্‌, ঢাকা

৪৯১.৪৪৩
বি - ৩০২
Acc ২৪৯৭৫
০৬/০৭/২০০৭

১৩৪৬

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার

শ্রীনারসিংহ প্রেসে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

কল্পনা দেবী

প্রীতিভাজনাসু

কল্পনা,

তুমি আজ কোথায় জানিনে। তবে যেখানেই থাক, আমার এই সামান্য প্রীতি-উপহার তোমার কাছে পৌঁছাবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। ইতি—

ভূমিকা

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিপূর্ব্বে মাসিক এবং বার্ষিক শিশুসাথীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেগুলো এবং আরও কয়েকটি এখন এই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হ'ল। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম এবং নিত্যই নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন কর্‌ছে। এই সকল বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি কাজে লাগ্‌ছে এবং লাগ্‌তে পারে তা'রই কিছু এই প্রবন্ধগুলোতে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। আশাকরি আমার এই প্রচেষ্টা সফল হ'য়ে আমাকে আনন্দিত কর্‌বে। ইতি—

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
দৈবাৎ	...	...	১
কার্‌বাইড্	...	...	১৮
হার্ড ওয়াটার্	...	...	২২
রামধনু	...	...	৩১
সেলোফেন্	...	...	৩৭
আকাশ-ফটোগ্রাফী	..	...	৪১
সী-ড্রোম্	...	...	৪৯
মার্‌সিরাইজ্‌ড্ সিল্ক	...	...	৫৮
আবর্জ্জনার মূল্য	...	...	৬৪
থার্ম্মোমিটার্	...	...	৭০
কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী	...	...	৮১
ড্রাই-ক্লিনিং	...	...	৮৬
পেরিস্‌কোপ্	...	...	৯০
কেসিন্	...	...	৯৬
ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্	...	...	১০০
জীয়ান খাদ্য	...	...	১১৪
ব্যাকালাইট্	...	...	১২২

নিউটন।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দৈবাৎ

হঠাৎ বড়লোক হওয়া, লটারীতে দৈবাৎ টাকা পাওয়া প্রভৃতির কথা প্রায়ই শোনা যায় এবং খবরের কাগজেও দেখা যায়। তোমরা হয়তো এইরকম গল্প অনেক শুনেছ এবং খবরের কাগজে প'ড়েছ। এইরকম কথিত আছে যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া শৈশবাবস্থায় মোটেই জান্‌তেন না যে, পরে তিনিই ইংলণ্ডের সিংহাসনে বস্‌বেন। একদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি জান্‌তে পার্‌লেন, তাঁর খুল্লতাত চতুর্থ উইলিয়ম্ মারা গেছেন এবং তাঁর কোনও সন্তানাদি না থাকাতে ভিক্টোরিয়াই রাণী হবেন। এহেন ভয়ানক ব্যাপার অকস্মাৎ হ'য়ে গেল! আবার, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রণ (Lord Byron) নাকি একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে

ওঠার পর হঠাৎ জান্‌তে পার্‌লেন যে, মাত্র এক রাত্রের মধ্যেই তিনি একজন অসাধারণ লোক হ'য়ে উঠেছেন। এই রকম ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়।

বিজ্ঞান-জগতেও এইরকম হঠাৎ যে কত বড় বড় আবিষ্কার ঘটেছে তা'র সম্যক্ খবর খুব কম লোকই জানে। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এইরকম দৈবাৎ হ'য়ে গেছে ; তাও আবার নিতান্ত সাধারণ এবং সামান্য ঘটনা থেকে! আমাদের চারদিকে প্রত্যহ কত প্রকার ঘটনা ঘট্‌ছে, সে সকলের কোনও খবরই আমরা রাখিনে। কিন্তু এই প্রকার সামান্য ঘটনা অবলম্বন ক'রে কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হয়েছে সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বল্‌ছি।

প্রথমে ধর—ঘড়ির কথা। ঘড়ি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। ঘড়ি না হ'লে বর্ত্তমান জগৎ একরকম অচল। প্রতি কাজই ঘড়ি ধ'রে ঠিক সময়ে কর্‌তে হয়। এই ঘড়িও সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করার মূলে কিন্তু একটি অতি সাধারণ ঘটনা—তোমরা খুব সম্ভবতঃ তা' জান না।

ইটালী দেশের পদার্থবিদ্ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্যালিলিওর (Galileo) নাম বিজ্ঞান-জগতে প্রসিদ্ধ। ইংরাজী ১৫৬৪ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ঘড়ি তৈরী করার উপায়

যখন আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। তিনি পিসা (Pisa) নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়্তেন। সেইখানে পড়ার সময়ে একদিন তিনি পিসার গীর্জ্জার ভিতরে উপসনার জন্যে গিয়ে দেখ্তে পেলেন যে, গীর্জ্জার উঁচু ছাদ থেকে একটি ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত লণ্ঠন ঝুল্ছে এবং সেই লণ্ঠনটি হাওয়াতে দুল্ছিল—একবার ডান দিকে এবং আর একবার বাঁ দিকে। তিনি আরও লক্ষ্য কর্লেন যে, একবার ডান থেকে বাঁ দিকে অথবা বাঁ থেকে ডান দিকে আস্তে যত সময় লাগ্ছে, প্রতি বারই ঐ রকম আস্তে সমান সময় লাগ্ছে; অর্থাৎ একবার ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে যেতে যদি এক সেকেণ্ড লাগে, তা' হ'লে একবার বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে যেতেও ঠিক এক সেকেণ্ডই লাগ্বে এবং প্রত্যেকবার এই রকম ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে অথবা বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে আস্তে এক সেকেণ্ডই সময় লাগ্বে!

গ্যালিলিও

কিন্তু শুধু চোখে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্লেন না।

তিনি সেই লণ্ঠনটির ডান থেকে বাঁ দিকে যাওয়া এবং বাঁ থেকে ডান দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে নিজের নাড়ী টিপে ধ'রে দেখ্‌লেন যে, তাঁর নাড়ীও ঠিক সমান তালে ধুক্‌-ধুক্‌ করছে। তখন গ্যালিলিও স্থির করলেন যে, লণ্ঠনটি ঠিক সমানভাবে ডান দিকে এবং বাঁ দিকে দুলছে—প্রত্যেক দোলার সময় সমান।

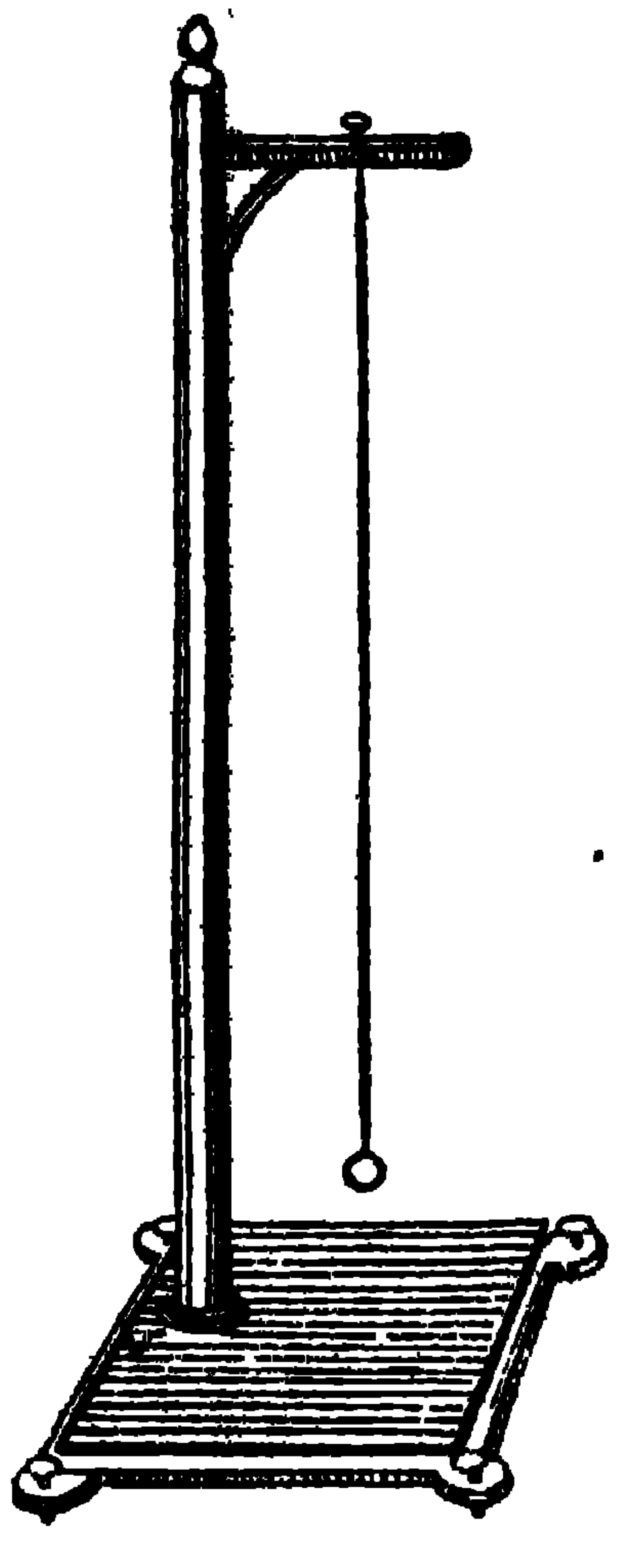

দোলক

এই বিষয় ভাল ক'রে লক্ষ্য করাতে তাঁর মনে ঘড়ির দোলক অথবা পেণ্ডুলাম্‌ (Pendulum)-এর কথা উদয় হ'ল। তিনি এই ব্যাপার দেখে নিজের ল্যাবরেটরীতে ব'সে গবেষণা আরম্ভ করলেন এবং শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে, শুধু লণ্ঠন নয়,—যে কোনও ভারী জিনিসই একটি হাল্‌কা দড়ি অথবা সূতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, সেই জিনিসটিকে একটু দোলা দিলে তা'র প্রত্যেক দোলাই সমান হবে, অর্থাৎ একবার বাঁ থেকে ডান দিকে যেতে অথবা ডান থেকে বাঁ দিকে আস্‌তে যত সময় লাগ্‌বে, প্রত্যেক বারই ঠিক সেই সময় লাগ্‌বে—একটু বেশীও নয়, কমও নয়। এই রকমে ঘড়ির পেণ্ডুলাম্‌ আবিষ্কার করা হ'ল।

প্রথমে এই পেণ্ডুলাম্ ডাক্তারেরা রোগীর নাড়ীর গতি পরীক্ষা করার জন্যে ব্যবহার কর্‌তেন, কিন্তু পরে ক্রমশঃ আজকালকার ঘড়ি তৈরী হ'ল। একটি লণ্ঠন অথবা কোনও ভারী জিনিস দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ্‌লে সেইটি হাওয়াতে দুল্‌তে থাকে, এ অতি সামান্য এবং সাধারণ ব্যাপার। আমরা প্রায়ই এই ব্যাপার দেখে থাকি, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার হ'তেই অত বড় একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'য়ে গেল!

তোমরা "রবার" নিশ্চয়ই দেখেছ এবং রবার কি জিনিস তাও বোধ হয় জান। রবার এখন আমাদের প্রায় সকল রকম কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে—মোটরগাড়ী, সাইকেল প্রভৃতি যান-বাহনের চাকা, ফুটবল, টেনিস্ বল, নানা প্রকার খেল্‌না, বেলুন প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস তৈরী করার কাজে রবারের একান্ত প্রয়োজন। এমন কি, ইউরোপে রবারের এক প্রকার মাদুর এবং কার্পেট তৈরী ক'রে ঘরের মেঝের ওপরও পাতা হয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে—রবার না হ'লে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ শিল্পই অচল। কিন্তু এই রবার যখন সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করা হয় তখন তা' হ'তে কোন প্রকার জিনিস প্রস্তুত করা সম্ভবপর ছিল না।

তোমরা খুব সম্ভবতঃ জান, রবার এক জাতীয় গাছের আঠা হ'তে পাওয়া যায়। যখন রবারগাছ থেকে আঠা বা'র

হয় তখন উহা চট্‌চটে অবস্থাতেই থাকে, উহার কোনও জোর থাকে না। এই আঠায় একটু গরম লাগ্‌লেই একেবারে গ'লে যায়, সুতরাং তা'কে কোনও ভারী কাজে দেওয়া যায় না। এই অসুবিধার জন্যে কি উপায়ে রবারকে শক্ত করা যায় তা'ই এক মহা সমস্যা ছিল, কিন্তু তা' প্রায় একশ' বছর পূর্ব্বেকার কথা। এখনকার অধিকাংশ লোকই হয়তো ঐ সমস্যার কোনও খবরই রাখে না।

যা' হোক্, ঐ সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন একজন আমেরিকাবাসী। তাঁর নাম চার্ল্‌স্ গুড্‌ইয়ার্ (Charles Goodyear)। কি উপায়ে রবারকে শক্ত ক'রে সকল রকম কাজের উপযোগী করা যায় সেই সম্বন্ধে গুড্‌ইয়ার্ পরীক্ষা কর্‌ছিলেন। এইরকম পরীক্ষা করার সময়ে একদিন হঠাৎ তিনি নিতান্ত অকারণে রবারের সঙ্গে সাল্‌ফার্ (Sulphur) অর্থাৎ গন্ধক মিশিয়ে দিলেন। এইরকম মিশ্রণের ফলে ঐ রবার এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হ'ল যে, তখন তা'কে সকল রকম কাজে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রথাটির নাম ভাল্‌কানাইজেশন্ (vulcanisation)। আর কালবিলম্ব না ক'রে গুড্‌ইয়ার্ তখনই এই প্রথাটিকে পেটেন্ট্ (patent) ক'রে ফেল্‌লেন, অর্থাৎ ঐ প্রথাতে রবার শক্ত করা একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেউই কর্‌তে পারবেন না।

অতঃপর গুড্ইয়ার্ নানাপ্রকার রবারের সামগ্রী বিক্রয় ক'রে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একজন বিশিষ্ট ধনবান্ ব্যক্তি হ'য়ে উঠ্লেন এবং এখনও গুড্ইয়ার্ মার্কা মোটরের টায়ার্ (Tyre) অথবা রবারের চাকা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এত বড় একটি আবিষ্কার দৈবাৎ হ'য়ে গেল—অনেকেই তা'র খবর রাখে না।

তোমরা হয়তো জান না, আমাদের বাংলাদেশে এক সময়ে প্রচুর নীলের চাষ ছিল। এই "নীল" একরকম রং বিশেষ এবং এই পদার্থটির রংও ঠিক নীলবর্ণেরই মত। এক প্রকার গাছ থেকে এই পদার্থটি পাওয়া যায়। এখন যেমন পাটের চাষে বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে, তখনও এই নীলের চাষ বাংলা-দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই হ'ত। ইংরাজ মালিকগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই চাষ চল্‌ত। নীলের চাষের জন্যে দেশের প্রায় সকল স্থানেই কুঠী অথবা ছোট ছোট ফ্যাক্টরী, বাড়ী প্রভৃতি থাক্‌ত। এই সকল কুঠী, "নীলকুঠী" নামে বিখ্যাত।

এক সময়ে এই নীলের চাষ বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হ'ত, কিন্তু এখন দৈবাৎ কোথাও হয়তো নীলের চাষ দেখ্তে পাওয়া যায়। এইরকম অবস্থার একমাত্র কারণ এই যে, এখন রাসায়নিক উপায়ে অপেক্ষাকৃত সস্তায় প্রচুর পরিমাণে নীল তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে এবং তা'র ফলে গাছের নীল এখন

আর দেখা যায় না। এত বড় একটি ব্যাপারের মূলে রয়েছে একটি অতি সাধারণ ঘটনা—সেইটি এইবার বল্‌ছি।

বহুদিন থেকেই রাসায়নিক উপায়ে নীল তৈরী কর্‌তে পারা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে ইউরোপে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা কর্‌ছিলেন। তাঁদের গবেষণার পরে সিদ্ধান্ত হ'ল যে, যদি ন্যাপ্‌থালীনের (Napthalene) সঙ্গে কোনও ক্রমে অক্সিজেন্ (Oxygen) সংযুক্ত ক'রে দেওয়া যায়, তা' হ'লে নীল তৈরী হ'তে পারে। এই ন্যাপ্‌থালীন্ কি তা' বোধ হয় তোমরা জান —গরম জামা, পোষাক প্রভৃতিতে ন্যাপ্‌থালীন্ দিয়ে রাখ্‌লে তা'তে পোকা লাগে না। কিন্তু অক্সিজেন্ কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারাই ন্যাপ্‌থালীনের সঙ্গে মেশে না। একটি কাচের পাত্রে ঐ পরীক্ষা চল্‌ছিল এবং পাত্রটির উত্তাপ পরিমাপের জন্যে তা'র গায়ে একটি থার্ম্মোমিটার্ (Thermometer) লাগান ছিল। ঐ থার্ম্মোমিটার্‌টি একজন সহকারীর অসাবধানতা-বশতঃ তা'র হাত লেগে ভেঙ্গে যায় এবং থার্ম্মোমিটারের ভিতরকার পারদটুকু সেই কাচের পাত্রের মধ্যে প'ড়ে গেল। এইরকম হওয়ার ফলে ঠিক যা' আশা করা হয়েছিল তা'ই পাওয়া গেল, অর্থাৎ পারদের সাহায্যে অক্সিজেন্, ন্যাপ্‌থা-লীনের সঙ্গে মিশে গেল এবং তাদের মিলনের ফলে নীল তৈরী হ'ল! অতঃপর এই উপায়ে বহু পরিমাণে নীল প্রস্তুত

হ'তে লাগ্‌ল এবং বাজারে বিক্রয়ও হ'তে লাগ্‌ল। ফলে, এদেশ থেকে নীলের চাষ ক্রমশঃ উঠে গেল। এখন বাজারে যে সকল নীল দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে সকলই রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত। এত বড় একটি ব্যাপার ঘ'টে গিয়েছে, কিন্তু তা'র মূলে রয়েছে ঐ অসাবধান সহকারীটির থার্ম্মোমিটার্ ভাঙ্গা! যদি থার্ম্মোমিটার্‌টি ঐভাবে না ভেঙ্গে যেত, তা' হ'লে নীল প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত হ'ত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনা পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক লোকই জানে।

এইবার জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত সার্ আইজাক্ নিউটন্ (Sir Isaac Newton)-এর আবিষ্কার, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বল্‌ছি। সার্ আইজাক্ নিউটনের নাম বিজ্ঞান-জগতে প্রসিদ্ধ এবং তিনি শুধু নিউটন্ নামেই পরিচিত। তিনি সারাজীবন ধ'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আবিষ্কার ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব; অর্থাৎ সকল গ্রহ সকল গ্রহকেই আকর্ষণ কর্‌ছে এই মতবাদ।

সে আজ অনেক দিন আগের কথা। তোমাদিগকে ঘড়ির দোলক অথবা পেণ্ডুলাম্-আবিষ্কারক, ইটালীর বিখ্যাত পণ্ডিত গ্যালিলিওর কথা ইতিপূর্ব্বেই ব'লেছি। তিনি ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান এবং সার্ আইজাক্ নিউটন্ ঠিক সেই বছরই জন্মগ্রহণ করেন।

নিউটন্ যখন কেম্‌ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন হঠাৎ কোথা থেকে একবার প্লেগ দেখা দিল—ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র আপন আপন বাড়ীতে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ল। নিউটন্‌ও নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। এই সময়ে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে ব'সে চিন্তা কর্‌ছেন। এমন সময়ে তাঁর সম্মুখস্থ একটি আপেলগাছ থেকে একটি পাকা আপেল খ'সে গিয়ে মাটির ওপর পড়্‌ল। অমনি নিউটনের মাথায় চিন্তার উদয় হ'ল—"আপেলটি গাছ থেকে মাটিতে পড়্‌ল কেন?" কিছুক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করার পরে তিনি স্থিব কর্‌লেন যে, তা'র কারণ আর কিছুই নয়, পৃথিবী আপেলটিকে আকর্ষণ কর্‌ছে। পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যই আপেলটি গাছ থেকে খ'সে গিয়ে মাটির ওপর এসে পড়্‌ল। এই রকম স্থির ক'রে নিউটন্ সিদ্ধান্ত কর্‌লেন যে, শুধু আপেল ব'লে নয়—পৃথিবী সকল জিনিসকেই সকল সময়ে আকর্ষণ কর্‌ছে; কোনও জিনিসই বিনা সাহায্যে শূন্যে থাক্‌তে পারে না।

অতঃপর নিউটন্ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—'আচ্ছা, পৃথিবী যদি সকল জিনিসকেই আকর্ষণ করে, আর যদি বিনা সাহায্যে কোনও বস্তুই শূন্যে থাক্‌তে না পারে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই পৃথিবী চাঁদকেও সকল সময়েই আকর্ষণ কর্‌ছে। সেইজন্যেই চাঁদ

নিজের ইচ্ছামত যেতে না পেরে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক্ খাচ্ছে। আবার এই অনুমান যদি সত্য হয় তা' হ'লে খুব সম্ভবতঃ সূর্য্যও পৃথিবী এবং গ্রহগুলোকে তা'র নিজের আকর্ষণের জোরে টেনে রেখেছে, যা'র জন্যে পৃথিবী এবং গ্রহগুলো আপন ইচ্ছামত চলাফেলা কর্‌তে পারে না—সূর্য্যের আকর্ষণের জোরে তা'র চারদিকে ঘুরে' বেড়ায়!

এইরকম মনে ক'রে নিউটন্ ষোল বছর ধ'রে সূর্য্য, চাঁদ, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে বহুপ্রকার অঙ্ক ক'ষে শেষে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশুদ্ধ লোকের সম্মুখে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, তাঁর এই নতুন আবিষ্কার সম্পূর্ণ সত্য। নিউটন্ প্রমাণ কর্‌লেন যে, পৃথিবী চাঁদকে সকল সময়েই আকর্ষণ কর্‌ছে; আবার সূর্য্যও চাঁদ এবং গ্রহগুলোকে আকর্ষণ কর্‌ছে। এই রকম আকর্ষণের ফলে সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে অর্থাৎ ঠিক মাঝখানে রেখে, তা'র চতুর্দ্দিকে পৃথিবী এবং গ্রহগুলো ঘুর্‌ছে। আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে চাঁদ তা'র চারদিকে ঘুর্‌ছে। নিউটনের এই আবিষ্কারের নাম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি এবং এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের অনেক কথা জানার উপায় হয়েছে। এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার এবং প্রমাণিত না হ'লে দিন রাত কেন হয়, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ কেন হয়, এই রকম আরও অনেক তথ্য জানা যেত না। কিন্তু এত বড় একটি আবিষ্কারের

মূলে রয়েছে একটি পাকা আপেল গাছ থেকে মাটিতে প'ড়ে যাওয়া—সেইটিই হচ্ছে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়।

এইবার "এক্‌স্‌-রে" (X-Ray) সম্বন্ধে বলা যাক্‌। তোমরা হয়তো এক্‌স্‌-রে কি তা' জান না; কিন্তু বর্ত্তমানকালে

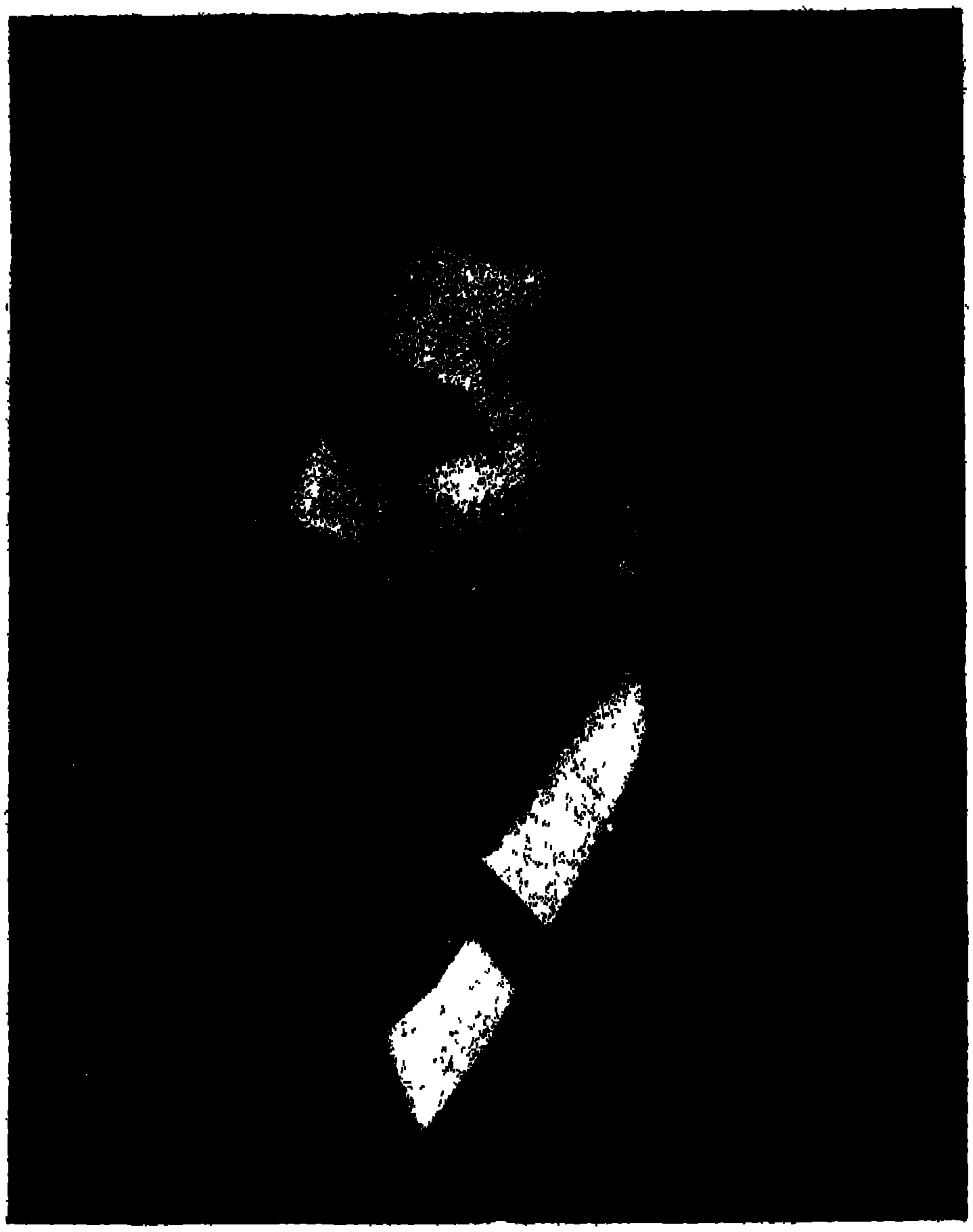

অধ্যাপক রণ্টজেন্‌

চিকিৎসাক্ষেত্রে এক্‌স্‌-রে খুবই প্রয়োজনীয়। এই উপায়টি না থাক্‌লে শরীরের ভিতরের বহুপ্রকার কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা

করা সম্ভবপর হ'ত না। এক্স্-রেকে কখনও কখনও তা'র আবিষ্কারক অধ্যাপক রণ্ট্জেনের (Professor Rontgen) নামানুসারে "রণ্ট্জেন্ রে" (Rontgen Ray) অথবা রঞ্জন-রশ্মি বলা হয়। কি ক'রে এই রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কৃত হ'ল সেই সম্বন্ধে বল্ছি।

তোমরা বোধ হয় জান না, একটি সরু এবং লম্বা কাচের টিউব অথবা নলের মধ্যে পারদ নামক তরল ধাতু ভর্ত্তি ক'রে সেই নলটি যদি একটি পারদপূর্ণ পাত্রের ওপর উপুড় ক'রে রাখা যায় তা' হ'লে আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বাতাসের চাপে নলের মধ্যকার পারদ ক্রমশঃ নীচে নেমে আসে এবং ঐ নলের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ নলটির ভিতরে

৩০ ইঞ্চির উপরে কিছুই থাকে না,—তা'র উপরে একেবারে খালি—শূন্য। তখন, অধ্যাপক রণ্ট্জেনের এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। পারদপূর্ণ নলের ভিতরে ৩০ ইঞ্চি পারদের উপরে ঐ

শূন্যের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ কিংবা স্পার্ক (Spark) অথবা স্ফুলিঙ্গ দিলে কি হয় সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্‌তে তিনি ভালবাস্‌তেন।

হাত

একদিন তিনি যখন এই রকম পরীক্ষা কর্‌ছিলেন তখন তাঁর টেবিলের দেরাজের মধ্যে কতকগুলো ফটোগ্রাফীর প্লেট্‌ ছিল। এই প্লেটের সাহায্যেই ফটো অর্থাৎ ছবি তোলা হয়। তিনি তাঁর ঐপ্রকার পরীক্ষার পরে দেরাজের ফটোগ্রাফীর প্লেট্‌গুলো ব্যবহার কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন যে, ঐ প্লেট্‌গুলো সমস্তই আলো লেগে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। অথচ তিনি কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন না যে,

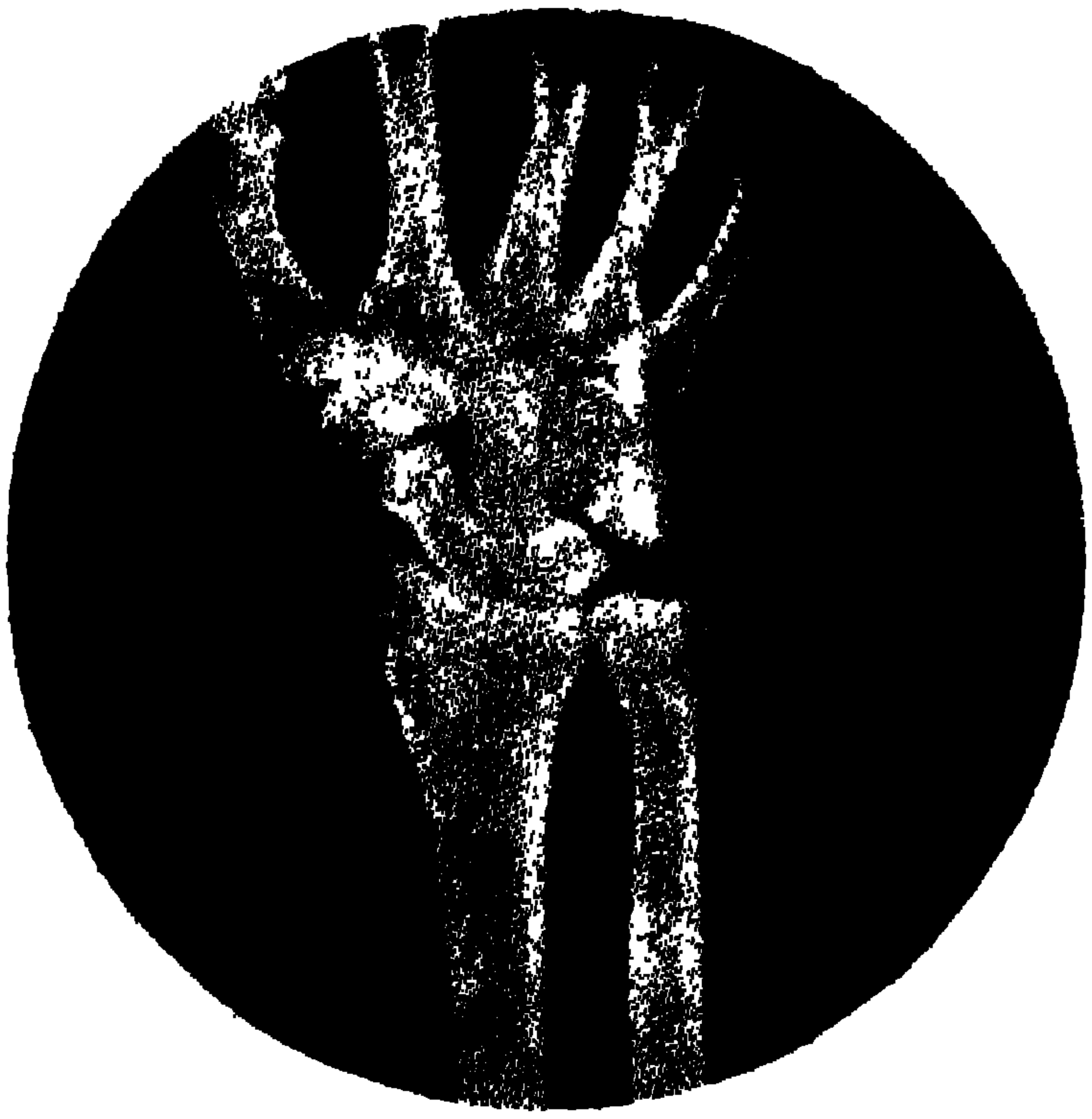

হাতের কব্জি

কি ক'রে সেই বন্ধ দেরাজের মধ্যে আলো প্রবেশ কর্‌তে

পারে। তিনি এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ কর্‌লেন এবং অনেক গবেষণার পরে বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, শূন্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ অথবা স্পার্ক (Spark) যেতে দিলে তা' হ'তে এমন একপ্রকার আলোক-রশ্মির সৃষ্টি হয়, যা' কাঠ অথবা এই প্রকার কোনও হাল্‌কা আবরণ

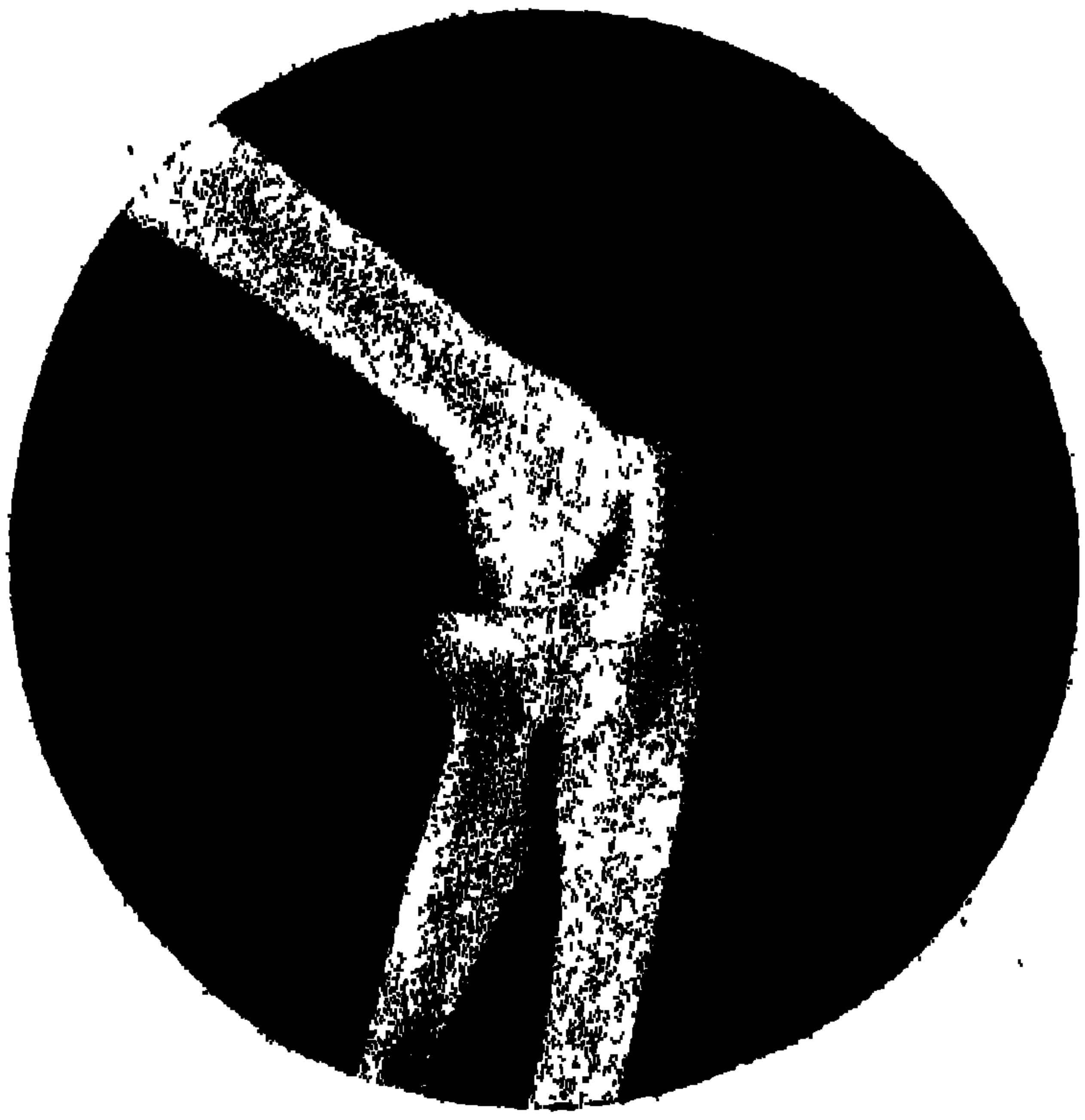

কনুই

হাঁটু

ভেদ ক'রে যেতে পারে।

রণ্ট্‌জেনের আবিষ্কারের পরে এই সম্বন্ধে তিনি এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বহুপ্রকার গবেষণা করেছেন, যা'র ফলে একটু সামান্য প্রয়োজনে চিকিৎসকগণ 'রণ্ট্‌জেন্ রে' বা [illegible]-রশ্মির সাহায্যে অনায়াসেই রোগের কারণ ঠিক করেন এবং তা'র চিকিৎসাও চালান।

মনে কর, কারও হাত বা পা ভেঙ্গে গেছে—কিন্তু বা'র থেকে কিছু বুঝা যাচ্ছে না। আগেকার দিনে এইরকম অবস্থাতেই রোগীকে কাটাতে হ'ত এবং যতদিন না আপনিই ভাল হ'ত ততদিন বিশেষ কিছুই করা সম্ভবপর হ'ত না। কিন্তু এখন এইরকম অবস্থাতে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে হাত, পা

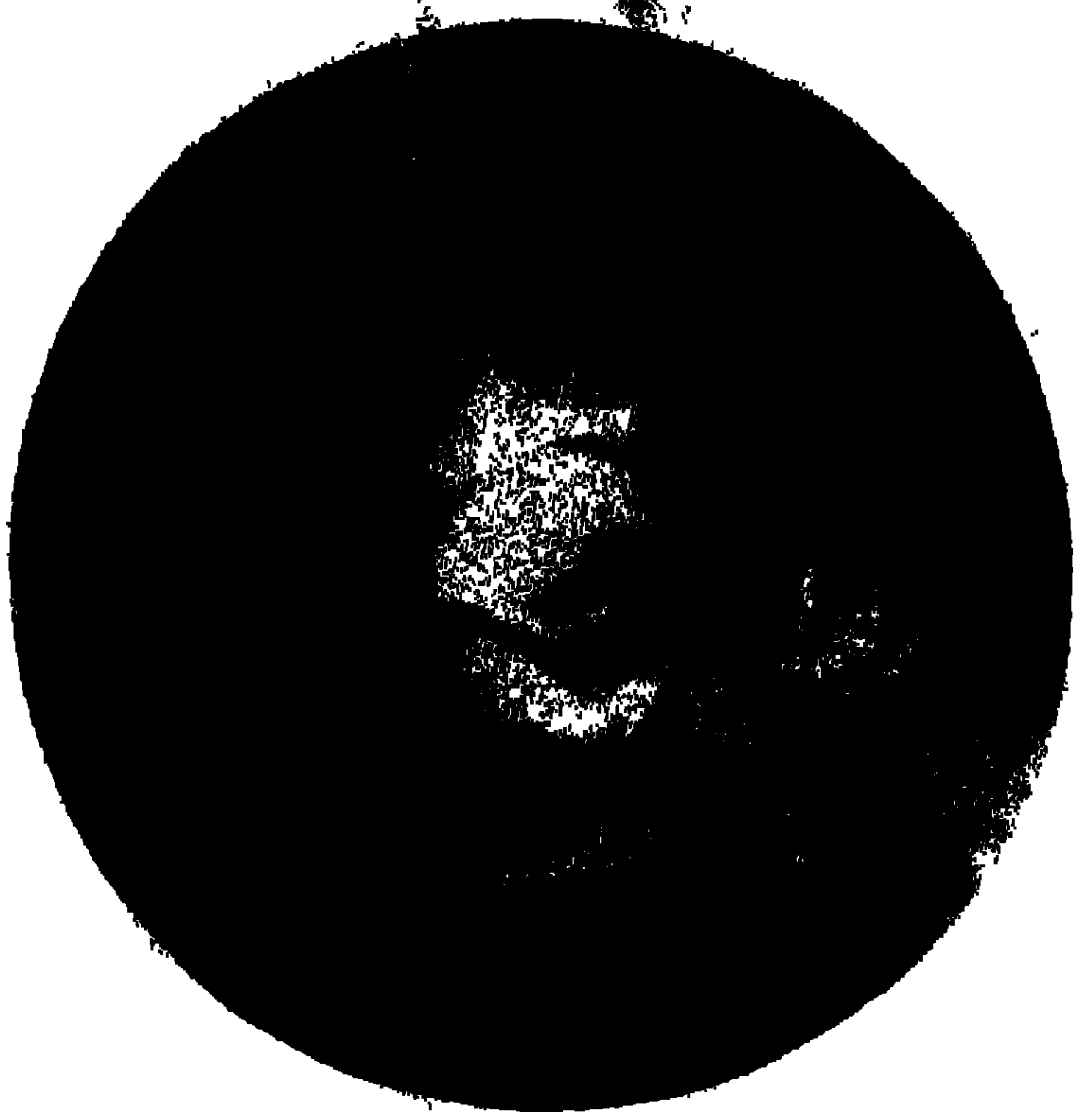

পায়ের গোড়ালি

ভেঙ্গে গেছে কিনা তা' নির্ণয় করা খুবই সহজ হয়েছে এবং তা'র চিকিৎসাও এখন পূর্ব্বেকার তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে। রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে তোলা ছবিতে হাত, পা প্রভৃতি কেমন দেখায় তা ছবিগুলো দেখ্‌লেই বুঝা যাবে।

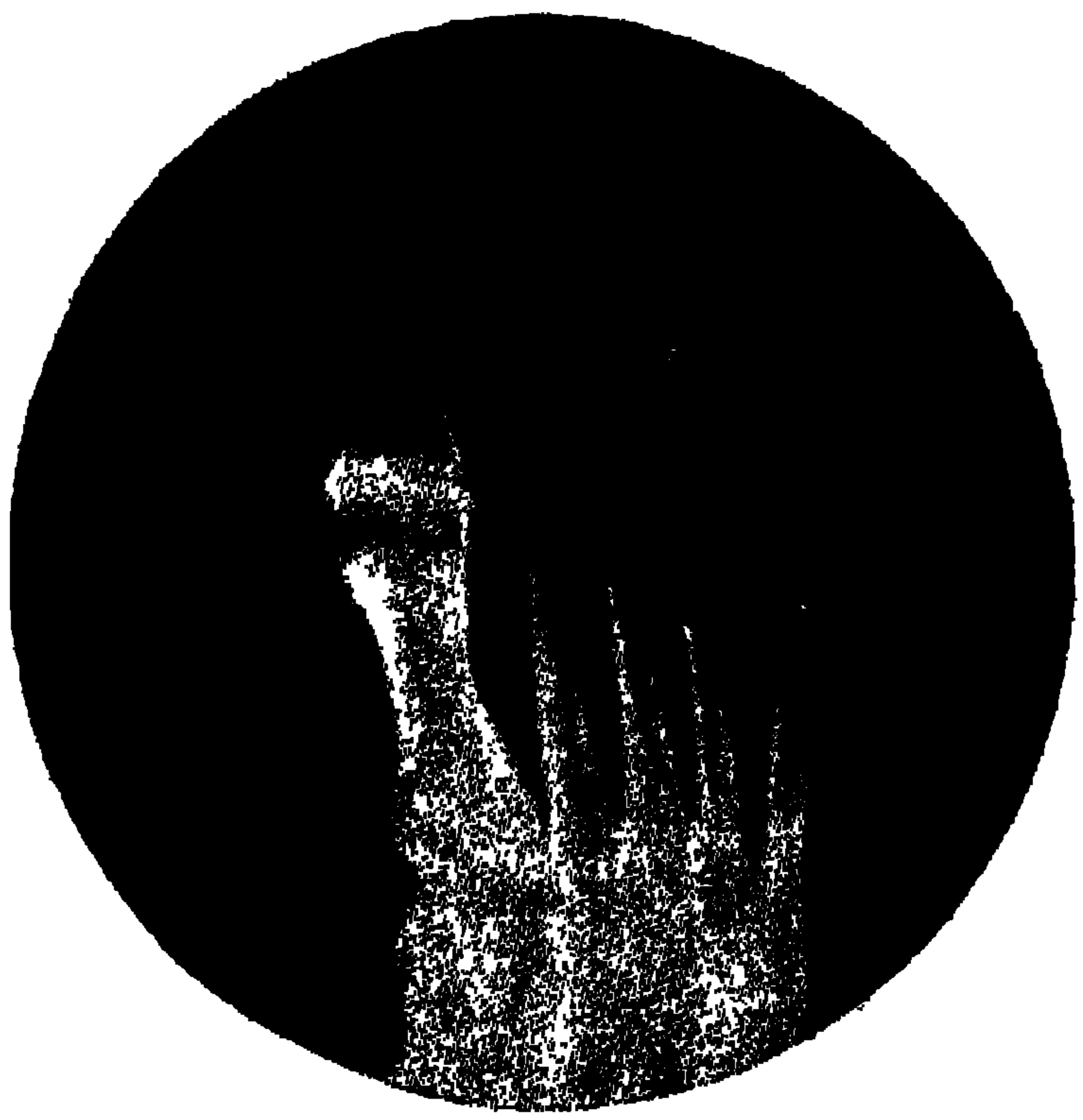

পায়ের পাতা

রঞ্জন-রশ্মি না থাক্‌লে ..., ক্যান্‌সার, পেটের বহু প্রকারের

রোগ প্রভৃতি চিকিৎসা করা একপ্রকার অসম্ভব হ'ত। কিন্তু এমন প্রয়োজনীয় একটি জিনিস আবিষ্কারের মূলে রয়েছে রণ্ট্জেনের পরীক্ষার সময়ের ঐ আকস্মিক ঘটনাটিই। যদি সেদিন টেবিলের দেরাজে ছবি তোলার প্লেটগুলো না থাক্ত, তা'হ'লে এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি আবিষ্কার করা যেত কিনা বলা শক্ত। এই আবিষ্কারটি দৈবাৎ হ'য়ে গেছে বল্তে হয়।

এই রকম আকস্মিক ঘটনা হ'তে কত প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য যে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তা'র ঠিক নেই। কিন্তু সাধারণ লোকে শুধু সেই সকল বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা মানব-জগতের কি উপকার হচ্ছে তা'রই খবরটুকু রাখে—কি ক'রে যে সেই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছিল তা' খুব সম্ভব জানে না।

কার্‌বাইড্‌

কার্‌বাইড্‌ কথাটি বোধ হয় অনেকেরই শোনা আছে এবং অনেকেই—বিশেষ ক'রে যা'রা পল্লীগ্রামে থাকে তা'রা—হয়তো কার্‌বাইড্‌ দেখেছেও। এই কার্‌বাইড্‌ জিনিসটি কি সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

কার্‌বাইড্‌ একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। এই জিনিসটির সম্পূর্ণ নাম—ক্যাল্‌সিয়াম্‌ কার্‌বাইড্‌ (Calcium Carbide)। অত বড় নাম না ব'লে সংক্ষেপে শুধু 'কার্‌বাইড্‌' বলা হয়। শাদা গুঁড়া-চূণ এবং কোক্‌ (একপ্রকার ধূম-হীন পাথুরে কয়লা) একত্রে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩৪০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করলে ঐ বস্তু দুটির মধ্যে রাসায়নিক মিলন আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ক্যাল্‌সিয়াম্‌ কার্‌বাইড্‌ প্রস্তুত হয়। কার্‌বাইড্‌ প্রস্তুত করতে হ'লে খুব বেশী উত্তাপের আবশ্যক। সাধারণ চুল্লী অথবা কয়লার উনানে ৪০০ অথবা ৪৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ পাওয়া যায়; সুতরাং ঐ প্রকার কয়লার উনান অন্ততঃ আটটি জ্বাল্‌লে তবে ৩৪০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ পাওয়া সম্ভব হবে এবং কার্‌বাইড্‌ প্রস্তুত করা যাবে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে

দেখা গিয়েছে যে, কয়লার উনান যতগুলোই জ্বালান যাক না কেন, ৩৪০০ ডিগ্রী উত্তাপ পাওয়া যায় না। কাজেই কার্বাইড্ প্রস্তুতের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লী ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই।

শাদা গুঁড়া-চূণের রাসায়নিক নাম ক্যাল্সিয়াম্ অক্সাইড্ (Calcium Oxide) এবং কোকের রাসায়নিক নাম কার্বন্ (Carbon) ; এই দুটি জিনিসের সম্মিলনে প্রস্তুত হয় ব'লেই কার্বাইডের রাসায়নিক নাম হয়েছে 'ক্যালসিয়াম্ কার্বাইড্'।

কার্বাইডের একটি প্রধান গুণ এই যে, জলের সঙ্গে একত্রে রাখ্লে তাদের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়— সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। সেই গ্যাসের নাম অ্যাসিটিলীন্ (Acytylene)। অ্যাসিটিলীন্ একটি দাহ্য গ্যাস্ এবং সামান্য একটু আগুন অথবা একটি জ্বলন্ত দেশলাইএর কাঠির সংস্পর্শেই উহা জ্বল্তে আরম্ভ করে। অ্যাসিটিলীন্ যখন জ্বলে, তখন শাদা ধব্ধবে আলো হয়। সেইজন্যে কেরোসিনের আলোর মত অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের আলো ব্যবহার করা যায়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রেছ পল্লীগ্রামে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য উপলক্ষে অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের আলো অনেক ব্যবহার করা হয়। দু-তিনটা অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের আলো জ্বাল্লে একটি প্রকাণ্ড ঘর দিনের

মত আলোকিত হয়। আজকাল সহরেও কোনও কোনও উৎসবের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রীক্ আলোর পরিবর্ত্তে অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের আলো ব্যবহার করা হয়। ঘরের আলো, সাইকেলের আলো, মোটরগাড়ীর আলো প্রভৃতি সব রকম আলোতেই অ্যাসিটিলীন্ গ্যাস্ ব্যবহার করা যায়।

অ্যাসিটিলীন্ গ্যাস্ রাসায়নিকগণের কাছে বহুদিন হ'তেই সুপরিচিত ছিল। তবে কি ক'রে এই গ্যাস্ বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় তা' তাঁরা জান্‌তেন না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন বৈজ্ঞানিক এই গ্যাস্ বহু পরিমাণে তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁরাই প্রমাণ ক'রেছিলেন যে, কোক্ ও চূণ একত্রে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে গরম কর্‌লে ক্যাল্‌সিয়াম্ কার্‌বাইড্ পাওয়া যায় এবং এই ক্যাল্‌সিয়াম্ কার্‌বাইড্ জলের সাহায্যে অ্যাসিটিলীন্ গ্যাস্ উৎপন্ন করে।

সাধারণতঃ অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের একরকম গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মোটেই আরামদায়ক নয়। বেশীক্ষণ অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের গন্ধ আঘ্রাণ কর্‌লে মাথা ধ'রে যায় এবং শরীরের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হয়। রাসায়নিকগণ বলেন যে, সাধারণতঃ যে কার্‌বাইড্ বাজারে বিক্রয় করা হয় তা'তে অনেক রকম ময়লা থাকে এবং তা'র জন্যেই অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসে ঐ রকম গন্ধ হয়। বিশুদ্ধ কার্‌বাইড্ হ'তে যে

অ্যাসিটিলীন্ উৎপন্ন হয় তা'তে কোনও প্রকার গন্ধই হয় না।

তোমরা অ্যাসিটিলীন্ গ্যাসের আলো অনেক দেখেছ, এবং অ্যাসিটিলীনের জীবনীশক্তি যে জল ও কার্বাইডের উপর নির্ভর করে, তা'ও বোধ হয় তোমাদের জানা আছে। জল বা কার্বাইড্ ফুরিয়ে গেলে গ্যাস্ বন্ধ হ'য়ে যায়; কাজেই তখন আবার নতুন কার্বাইড্ ও নতুন জল দিলে তবে আলো জ্বলে। কার্বাইডের দাম খুব বেশী নয় ব'লে ক্রমশঃ উহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্বাইড্ দেখ্তে ছাই-রঙের।

অ্যাসিটিলীন্ গ্যাস্ ছাড়া ক্যাল্সিয়াম্ সাইনামাইড্ প্রস্তুত করার কাজে কার্বাইড্ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ক্যাল্সিয়াম্ সাইনামাইড্ একপ্রকার সার; উহা ক্ষেতে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

হার্ড ওয়াটার্

গরমের ছুটীতে কৌশিক, মদন এবং হীরেন পুরীতে গিয়েছিল বেড়াতে।

পুরীতে পৌঁছে হীরেন বল্‌ল—"দেখ্ ভাই! চল, এখনই সমুদ্র দেখ্‌তে যাওয়া যাক্। অনেকদিন থেকেই ত পুরীর সমুদ্রের কথা বইতে প'ড়ে আস্‌ছি, আর লোকমুখেও শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখে বুঝ্‌ব সমুদ্র কি রকম!"

হীরেনের কথায় মদন সায় দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"শুধু শুধু আর সমুদ্র দেখ্‌তে যাওয়া কেন? তা'র চেয়ে বরং কাপড়, তোয়ালে, সাবান নিয়েই চল না কেন—একেবারে সমুদ্র দেখা এবং স্নানের কাজ দু'টাই একসঙ্গে হ'য়ে যাবে'খন। শুনেছি ট্রেনে ক'রে এত পথ আসায় যত কষ্ট হয়, সে সমস্তই একবার সমুদ্রে স্নান করলে দূর হ'য়ে যায়।"

মদনের কথায় সম্মতি জানিয়ে কৌশিক বল্‌ল—"ঠিক বলেছ ভাই! চল এখনই সমুদ্রের সন্ধানে যাওয়া যাক্। একেবারে দুই কাজ একসঙ্গে হবে'খন। একেই বলে, 'রথ দেখা আর কলা বেচা এই দুই কাজ একসঙ্গে করা'—নয় কি?"

একজন পাণ্ডার সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গেল।

সমুদ্র দেখে তাঁদের আনন্দ আর ধরে না! এর আগে কখনও তা'রা সমুদ্র দেখে নি—শুধু বইতেই সমুদ্রের নানা রকম বর্ণনা পড়েছে। এখন সমুদ্রের অগাধ নীল জল, একতলা, দু'তলা বাড়ীর সমান উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ, শাদা ফেনার মেলা, সমুদ্রতীরে বহু রকমের ঝিনুক প্রভৃতি দেখে তা'রা একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ সমুদ্রের শোভা দেখার পর তিন বন্ধু তিনজন 'লুনিয়া' ঠিক ক'রে সমুদ্রে স্নান করতে নাম্‌ল। লুনিয়ারা হাত ধ'রে স্নান করিয়ে নিয়ে আসে, না হ'লে নতুন লোকের পক্ষে সমুদ্রে স্নান করা খুবই বিপজ্জনক।

খানিকক্ষণ ঢেউ কাটিয়ে এবং সমুদ্রের নীল জল নিয়ে খেলা করার পর মদন গায়ে সাবান ঘস্‌তে সুরু কর্‌ল। কিন্তু বহুক্ষণ ঘসাঘসির পরেও সাবানের মোটেই ফেনা হ'ল না! তা' দেখে তা'র খুব রাগ হ'ল এবং "দুত্তোর" ব'লে সাবানটা তীরের দিকে ছুড়ে ফেলে দিল। তা'র অবস্থা দেখে কৌশিক হেসে বল্‌ল—"একেই বলে, 'নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠানের দোষ!' সস্তা দামের বাজে সাবানে কি আর ফেনা হয়? আমার এই পিয়ার্স সোপ্‌টা মেখে দেখ—একটু ঘস্‌লেই ফেনা হবে।"

কৌশিকের কথা শুনে মদন রেগে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ! সস্তার বৈ কি! আমারও পিয়ার্স সোপ্‌।"

"তাই নাকি!"—ব'লে কৌশিক তীর থেকে মদনের

সাবানটা নিয়ে দেখ্‌ল যে, মদনের সাবানখানা সত্যিই পিয়ার্স সোপ্‌।

কৌশিকের সাবানখানা নিয়েও মদন অনেক ঘসাঘসি কর্‌ল, কিন্তু তা'তেও ফেনা হ'ল না দেখে কৌশিক বল্‌ল— "কি আশ্চর্য্য! তোমারও পিয়ার্স সোপ্‌, আমারও পিয়ার্স সোপ্‌। পিয়ার্স সোপের মত ভাল সাবান খুব কমই আছে। কল্‌কাতায় একটু ঘস্‌লেই এর এত ফেনা হয় যে, দু-তিন মিনিট কলের জলে ধুয়ে ফেল্‌লে তবে সে ফেনা যায়। আর এখানে এত কষ্টেও ফেনা হচ্ছে না—এ যেন ভেল্কিবাজী!"

তাদের এই রকম অবস্থা দেখে লুনিয়ারা খুব হাস্‌ছিল। লুনিয়াদের ধমক দিয়ে মদন বল্‌ল—"হাস্‌ছিস্‌ কেন?"

লুনিয়ারা আবার একটু হেসে উত্তর দিল—"বাবু! এ জলে সাবানের ফেনা হয় না। বাড়ী গিয়ে যে জল খাবেন তা'তে সাবান ঘ'সে দেখ্‌বেন—ফেনা হবে।"

লুনিয়াদের কথা শুনে সাবান মাখার সকল আশা ত্যাগ ক'রে তিন বন্ধু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বাসায় ফির্‌ল এবং লুনিয়াদের কথা সত্য কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ল যে, সত্যিই সেই পিয়ার্স সাবান খাওয়ার জলে ঘসাতে তা'তে প্রচুর ফেনা হ'ল! তাই দেখে মদন বল্‌ল—"লুনিয়ারা তা' হ'লে সত্যি কথাই বলেছিল—আমরাই বোকা হ'য়ে গেলাম!"

কৌশিক উত্তর দিল—"তাই ত দেখ্‌ছি, কিন্তু কেন এমন হ'ল বল দেখি! সমুদ্রের জলে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্যে তা'তে সাবানের ফেনা হ'ল না।"

হীরেন বল্‌ল—"তা' ত বটেই, কিন্তু এখন ত এবিষয়ে কিছুই জানা যাবে না। কল্‌কাতায় ফিরে সঠিক খবর নিতে হবে। এখন চল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে যাওয়া যাক্।" এই ব'লে তা'রা তিনজন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গেল।

... ...

সমুদ্রের জলে কেন সাবানের ফেনা হয় না সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রধানতঃ দু' রকমের জল আছে—যথা, হার্ড ওয়াটার্ (Hard water) বা শক্ত জল এবং সফ্‌ট্ ওয়াটার্ (Soft water) বা নরম জল। তোমরা শুনে হয়তো খুবই হাস্‌বে এবং মনে মনে ভাব্‌বে, জলের আবার শক্ত, নরম কি! কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে এই কথা হাস্যোদ্দীপক হ'লেও বৈজ্ঞানিকদের কাছে জলের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সহরের কলের জল, পল্লীগ্রামের কূয়া অথবা পুষ্করিণীর জল, যা আমরা পান করি এবং নিত্য নানা কাজে ব্যবহার ক'রে থাকি, সেই জলে বিশেষ কোনও রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। বৈজ্ঞানিকগণের মতে উহা 'সফ্‌ট্

ওয়াটার্' অথবা কোমল জল। পার্ব্বত্য প্রদেশের কূয়া, ঝরণা বা নদীর জল এবং সমুদ্রের জলে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; সেইজন্যে উহা নিত্য ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী। বৈজ্ঞানিকেরা সেই রকম জলের নাম দিয়েছেন 'হার্ড ওয়াটার্' অথবা কর্কশ জল।

হার্ড ওয়াটারের একটি বিশেষত্ব এই যে, সেই জলে হাত ধুলে হাতের চামড়া খস্‌খসে হ'য়ে যায়। উহার আর একটি বিশেষত্ব, উহাতে সাবানের ফেনা হয় না। হার্ড ওয়াটারে জামা-কাপড় কাচ্‌লে প্রচুর সাবান ঘসার পরে সাবানের ফেনা হয় এবং এইভাবে অকারণ অনেক সাবান নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, হার্ড ওয়াটারে কাপড় কাচ্‌লে জলের উপরে ছানা অথবা দইএর মত এক রকম সর ভাস্‌তে থাকে। এই সরের মত ময়লা পদার্থটি কাপড়চোপড়ে লেগে যায় এবং কয়েকবার হার্ড ওয়াটারে কাপড়চোপড় কাচ্‌লে সেই সকল কাপড়ের রং ক্রমশঃ জ্বলে' গিয়ে বিবর্ণ হ'তে থাকে। এঞ্জিন অথবা বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতির বয়লারে (Boiler) হার্ড ওয়াটার্ ব্যবহার করা যায় না। কারণ, হার্ড ওয়াটার্ ব্যবহার কর্‌লে পাত্রের নীচে তলানী জমে' থাকে এবং পাত্রের গায়েও সরের মত পদার্থ লেগে যায়, অথচ বয়লারে কোনও রকম ময়লা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। হার্ড ওয়াটারে ভাল চা কিংবা

কফি তৈরী করা যায় না এবং যদি মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থের ভাগ খুব বেশী হয় তা'হ'লে সেই জল পান করার পক্ষেও অনুপযোগী। সাধারণ জলের তুলনায় হার্ড ওয়াটারের স্বাদও অন্য রকমের। কোনও কোনও হার্ড ওয়াটার্ অন্যান্য সকল রকম কাজের জন্যে ব্যবহার করা না গেলেও খুবই হজমকারী এবং সেইজন্যে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের ঝর্ণার জল পরীক্ষা ক'রে জানা গিয়েছে যে, কোনও কোনও জলের মধ্যে কার্বন্ ডাই-অক্সাইড্ (Carbon Dioxide) নামক গ্যাস্ দ্রবীভূত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; যেমন, ভিসির জল (Vichy water)। আবার কোনও জলে লৌহ, গন্ধক, আইওডিন্‌ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে সেই সকল জল দেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইউরোপের হ্যারোগেট্ (Harrowgate), ব্রিজ-ওয়েল্ (Bridgwell) প্রভৃতি স্থানের জল পান করাতে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কারণ, ঐ সকল স্থানের জলে উপরোক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে। আমাদের ভারতবর্ষেও শিমূলতলা, চূণার প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানগুলোতে জলের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে এবং সেইজন্যেই ঐ সকল স্থানগুলো খুবই স্বাস্থ্যকর।

হার্ড ওয়াটার্ আবার দু'রকমের আছে। বৈজ্ঞানিকগণ

সেই দু'রকম হার্ড ওয়াটারের নাম রেখেছেন—টেম্পোরারী (Temporary) হার্ড ওয়াটার্ অথবা সাময়িক শক্ত জল, আর অপরটি পার্মানেন্ট্ (Permanent) হার্ড ওয়াটার্ অথবা চিরস্থায়ী শক্ত জল। যে প্রকার হার্ড ওয়াটারে ক্যাল্সিয়াম্ (Calcium) কিংবা ম্যাগ্নিসিয়াম্ (Magnesium) ধাতুর "বাই-কার্ব্বোনেট্" (Bi-carbonate) নামক পদার্থ মিশ্রিত থাকে তা'কে সাময়িক শক্ত জল বলা হয়। কারণ এই প্রকার জল কড়াই অথবা অন্য কোনও পাত্রে কিছুক্ষণ ফুটালে জলের মধ্যস্থ ক্যাল্সিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেট্ অথবা ম্যাগ্নিসিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেট্ পদার্থটির বিশ্লেষণ ঘটে; তা'র ফলে অদ্রবণীয় ক্যাল্সিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ বা ম্যাগ্নিসিয়াম্ কার্ব্বোনেট, কারবন্ ডাই-অক্সসাইড গ্যাস্ এবং জল উৎপন্ন হয়। এই ক্যাল্সিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ ও ম্যাগ্নিসিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ অদ্রবণীয় ব'লে জলের উপর ভাস্তে থাকে এবং পাত্রের গায়েও লেগে যায়। তখন সেই জল কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিলে তা' সাধারণ জলের মতই সকল কাজে ব্যবহার করা যায়। সেই জলে সাবানের ফেনাও হয়। হার্ড ওয়াটার্কে এই প্রকারে সহজ উপায়ে সফ্ট্ অথবা কোমল করা যায় ব'লে বৈজ্ঞানিকেরা তা'কে সাময়িক হার্ড ওয়াটার্ বলেন।

টেম্পোরারী হার্ড ওয়াটার্ অথবা সাময়িক কর্কশ জলকে সফ্‌ট্ অথবা কোমল করার আরও তুটি উপায় আছে। এই জল চূণ অথবা চূণের জলের সাহায্যেও কোমল হ'তে পারে। টেম্পোরারী হার্ড ওয়াটারে চূণ মিশালে ক্যাল্‌সিয়াম্ অথবা ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেট্ অদ্রবণীয় ক্যাল্‌সিয়াম্ অথবা ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ কার্ব্বোনেটে পরিণত হয়। পরে উহা পূর্ব্বোক্তভাবে ছেঁকে নিলেই কোমল জলে পরিণত হয়। কিন্তু এই প্রথাতে খরচা অনেক পড়ে।

তবে বড় বড় কারখানা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্যে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাপেক্ষ আর একটি উপায়ে হার্ড ওয়াটার্‌কে সফ্‌ট্ করা হয়। এই প্রথাটির নাম পার্‌মিউটাইট্ প্রথা (Permutite Process)। এই প্রথাতে জল ফিল্‌টার্ (filter) অথবা পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত বালুকামিশ্রিত সোডিয়াম্ এবং এলুমিনিয়াম্ সিলিকেট্ (Sodium Aluminium Silicate) ব্যবহার করা হয়—এই পদার্থটির নামই পারমিউটাইট্। এই জিনিসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে হার্ড ওয়াটারের ক্যাল্‌সিয়াম্, পার্‌মিউটাইটের সোডিয়ামের সঙ্গে পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করে। ফলে, ক্যাল্‌সিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেটের পরিবর্ত্তে সোডিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেট্ জলে থেকে যায়।

জলে সোডিয়াম্ বাই-কার্ব্বোনেট্ থাক্‌লে বিশেষ কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, এই সহজ এবং সস্তা উপায়েই হার্ড ওয়াটার্ সফ্‌ট্ হ'তে পারে। পার্‌মিউটাইট্ প্রথার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, কিছুকাল পরে ব্যবহৃত পার্‌মিউ-টাইট্, লবণ জলে ডুবিয়ে নিলে পুনরায় পূর্ব্বের পদার্থ পাওয়া যায় এবং উহা পূর্ব্বের মত কাজ কর্‌তে থাকে। এইজন্যে এই প্রথাতে হার্ড ওয়াটার্‌কে সফ্‌ট্ বা কোমল করা খুবই সস্তা এবং এই প্রথাই ক্রমশঃ প্রচলিত হচ্ছে।

যে প্রকার হার্ড ওয়াটারে ক্যাল্‌সিয়াম্, ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Chloride) কিংবা সাল্‌ফেট্ (Sulphate) নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তা'কে পার্মানেণ্ট্ বা চিরস্থায়ী শক্ত জল বলা হয়। কারণ, এই প্রকার জলকে সহজে সফ্‌ট্ অথবা কোমল জলে পরিণত করা যায় না। সমুদ্রের জলে ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ ক্লোরাইড্ ও ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ সাল্‌ফেট্ নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে ব'লে সমুদ্রের জলকে সহজে সফ্‌ট্ বা কোমল করা যায় না এবং এই জল আমাদের কোনও কাজেই ব্যবহার করা চলে না। সেইজন্যে এই জলকে চিরস্থায়ী হার্ড ওয়াটার্ বলা হয়।

রামধনু

বর্ষাকালে বৃষ্টির পরে রৌদ্র উঠ্‌লে প্রায়ই লাল, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি নানা রকমের রং-যুক্ত ধনুকাকৃতি একটি জিনিস আকাশে দেখা যায়। তোমরাও নিশ্চয়ই তা' লক্ষ্য ক'রে দেখেছ। এই যে ধনুকের মত জিনিসটি, তা'র নাম রামধনু; তা'ও তোমরা জান। বর্ষাকালে এইরকম রামধনু দেখে বালক-বালিকাগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু রামধনু জিনিসটি কি এবং কি ভাবে উহার উদয় হয় তা' বোধ হয় তোমরা ঠিক জান না। এই রামধনু সম্বন্ধেই তোমাদিগকে কিছু বল্‌ছি।

রামধনুর কথা বল্‌তে গেলে প্রথমে সূর্য্যের আলো সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা প্রত্যহই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রচুর সূর্য্যের আলো দেখ্‌তে পাই এবং সেই আলো বর্ণহীন অথবা শাদা, তা' বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য ক'রেছ। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, সূর্য্যের এই শাদা আলো সাতটি বিভিন্ন বর্ণ-সমন্বয়ে প্রস্তুত; অর্থাৎ সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা রঙের আলো একত্রে মিলে সূর্য্যের শাদা আলো প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিকদের এই পরীক্ষার কথা শুনে তোমরা

হয়তো একটু আশ্চর্য্য বোধ কর্‌বে ও হাসবে। কিন্তু একটি সামান্য পরীক্ষার দ্বারাই এই সত্য প্রমাণ করা যায়।

অন্ধকার ঘরে একটি ছিদ্রপথে সূর্য্যের আলো প্রবেশ কর্‌তে দাও। পরে ঐ আলোক-রশ্মির সম্মুখে একটি ত্রি-কোণ

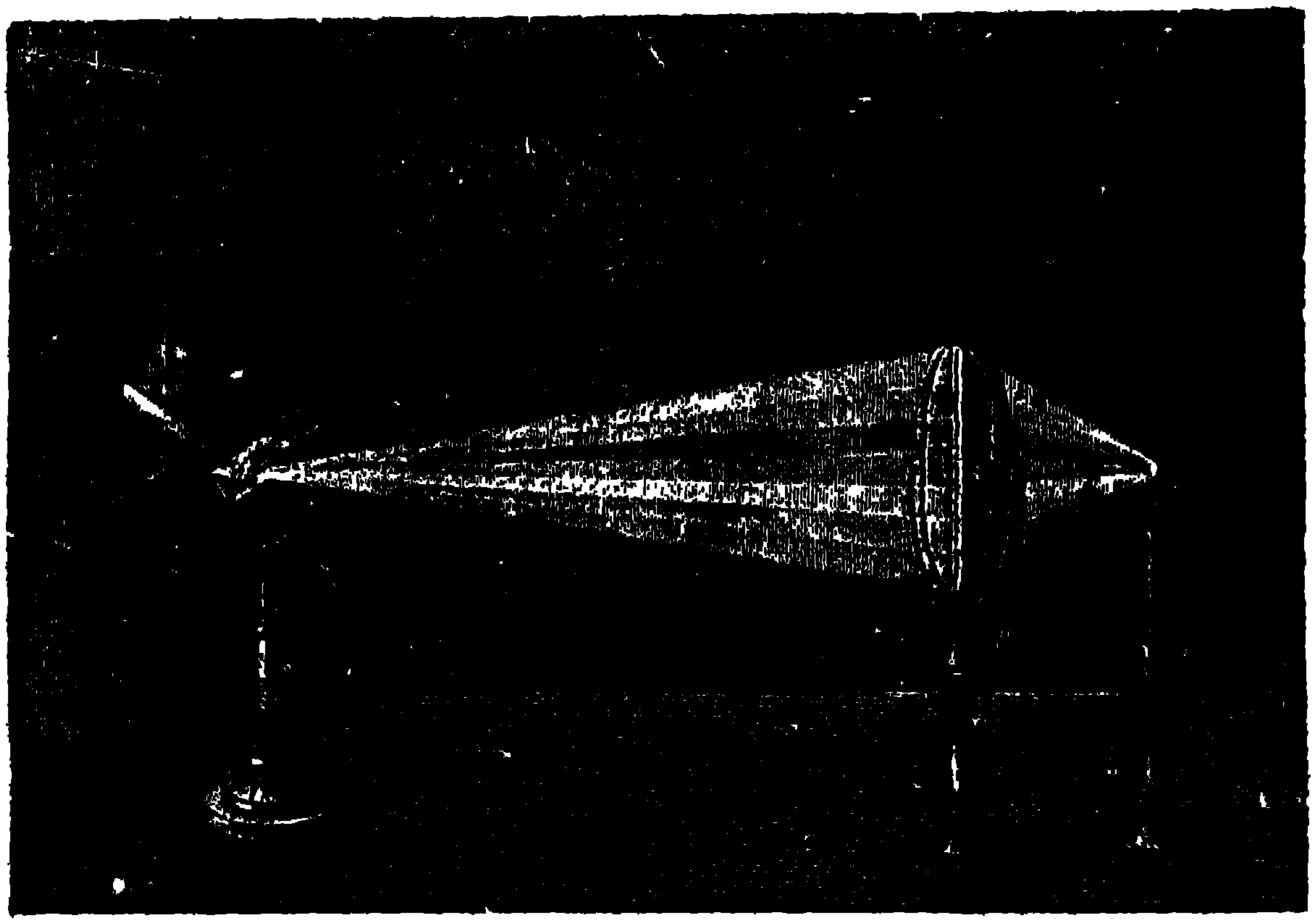

কাচ ধর্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, ঐ ত্রি-কোণ কাচের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো আসার সময়ে একটি সপ্তবর্ণের বর্ণ-ছত্র প্রস্তুত হয়েছে। এই রকম ত্রি-কোণ কাচের নাম প্রিজ্‌ম্ (Prism)। এই প্রিজ্‌মের এমনই গুণ যে, তা'র ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ ঘটে এবং তা'র ফলে আলোকরশ্মি বিভক্ত ও বিচ্ছুরিত হয়।

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ীতে বেলোয়ারী ঝাড় আছে তা'রা ঐ বেলোয়ারী ঝাড়ের ত্রি-কোণ কাচ নিয়ে এই পরীক্ষাটি অনায়াসেই করতে পার। প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো আসার কালে যে বর্ণ-ছত্র প্রস্তুত হয় সেইটি একটি শাদা কাপড়, শাদা পর্দ্দা অথবা দেওয়ালের ওপর পড়্‌লেই পর পর সাতটি বিভিন্ন রং পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। এই সাতটি রং—লাল, কমলালেবু, হল্‌দে, সবুজ, নীল, তুঁতে ও বেগুনী। এই সপ্ত-বর্ণের বর্ণ-ছত্রের নাম বর্ণালী; ইংরাজীতে উহাকে স্পেক্‌ট্রাম্‌ (Spectrum) বলা হয়।

এই সহজ পরীক্ষাটির দ্বারাই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার্‌ছ, সূর্য্যের আলো—লাল, কমলালেবু প্রভৃতি সাতটি বর্ণের সমন্বয়েরই ফল। আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন, এই সাতটি বর্ণ ছাড়া আরও বর্ণমালা সূর্য্যালোকে আছে।

আমরা সাধারণতঃ সেই সকল বর্ণ দেখ্‌তে পাই না—তা'রা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে। ঐ সকল বর্ণ প্রিজ্‌ম্‌ বা ত্রি-কোণ কাচের সাহায্যে দেখা যায় না—সেগুলো দেখ্‌তে হ'লে বিশেষ রকম যন্ত্রের প্রয়োজন। ঐ সকল বর্ণ সম্বন্ধে পরে বল্‌ব।

সূর্য্যের আলো অথবা শাদা আলো যে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে প্রস্তুত হয় তা' আর একটি পরীক্ষার দ্বারাও

প্রমাণ করা যায়। লাল, কমলালেবু, হল্‌দে, সবুজ, নীল, তুঁতে এবং বেগুনী এই সাতরকম রঙের কয়েকখণ্ড কাগজ নিয়ে একখানা গোলাকার কার্ডবোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। এখন বোর্ডটির কেন্দ্রস্থানে ছিদ্র ক'রে সেইটিকে একটি দাঁড়ের

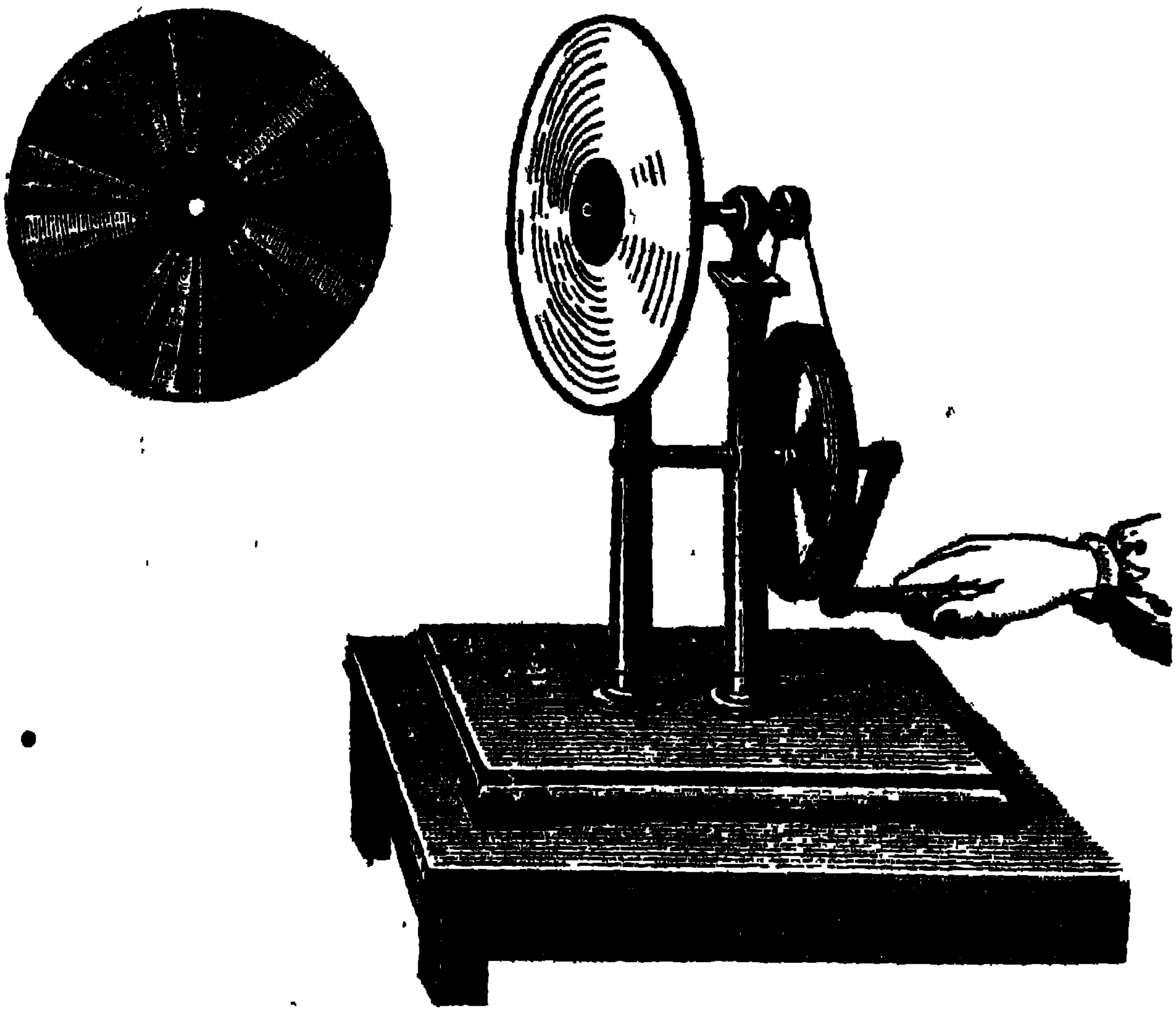

ওপর রাখ এবং তা'র পাশে ওপরের চিত্রের মত একটি হাতল লাগিয়ে দাও। এইবার বোর্ডটিকে জোরে ঘুরাতে থাক এবং ঐ ঘূর্ণ্যমান্ বোর্ডটির প্রতি তাকিয়ে দেখ। এখন, দেখ্‌তে পাবে

ঐ সকল বিভিন্ন বর্ণের স্থানে একটি শাদা রঙের জিনিস তোমার চোখের সামনে রয়েছে। এই পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণ হয়, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রং একত্রে মিলে শাদা আলো প্রস্তুত হয়।

এইবার রামধনুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বল্‌ছি। পূর্ব্বেই ব'লেছি, শাদা আলো বা সূর্য্যের আলো প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে গেলে সেই আলোকরশ্মির বিশ্লেষণ হয় এবং তা'র ফলে সাতটি ভিন্ন

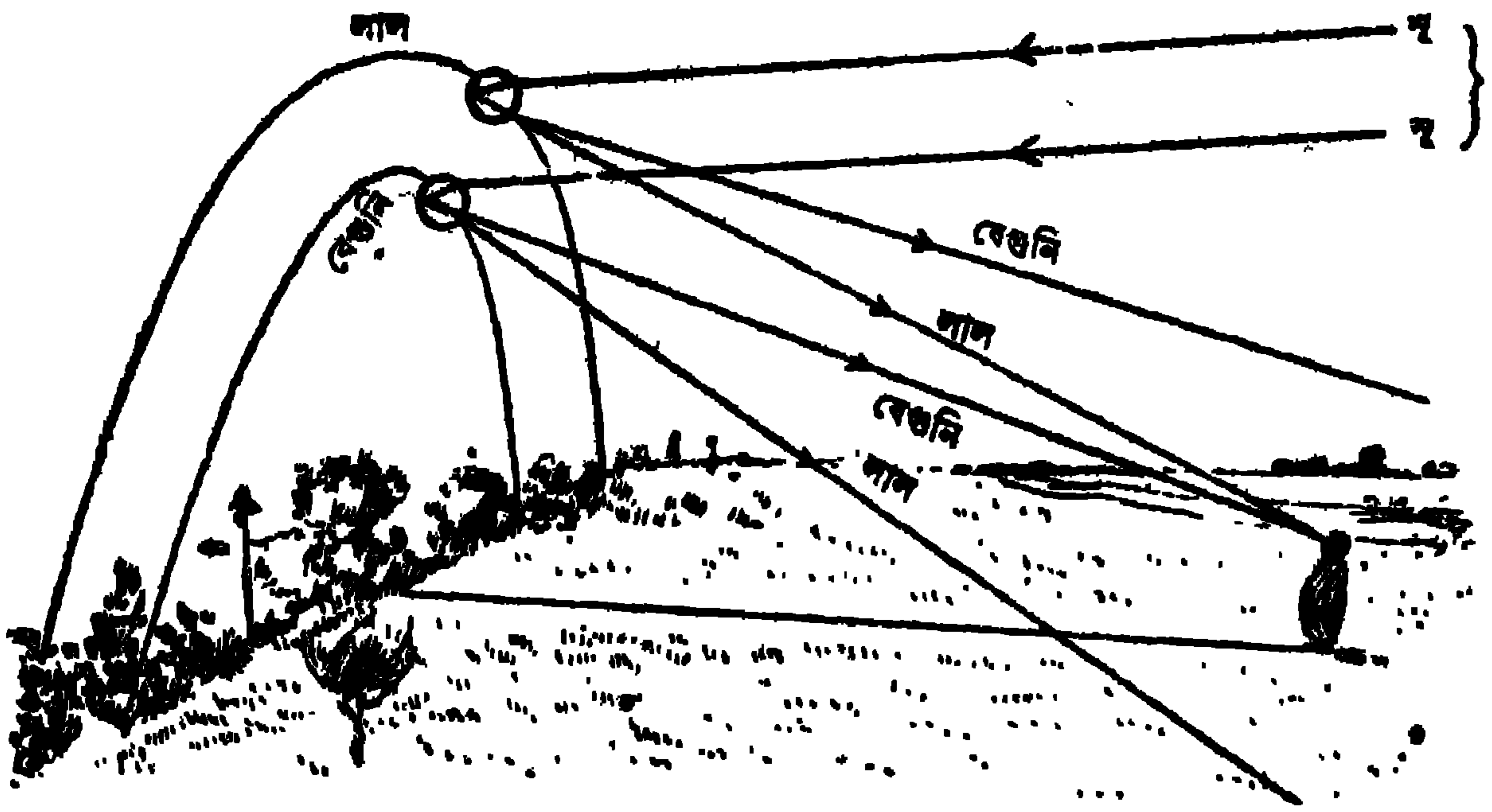

ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। রামধনুর মূলেও রয়েছে এই শাদা আলোকরশ্মির বিশ্লেষণ। বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিনে বায়ুমণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিপূর্ণ থাকে। এই ক্ষুদ্র জলকণাগুলো অনেকাংশে ত্রি-কোণ প্রিজ্‌মের আকার ধারণ করে এবং প্রিজ্‌মের কাজ করে। সূর্য্যের আলো ঐ সকল জলকণার

মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে তা'র বিশ্লেষণ ও প্রতিসরণ ঘটে ; যা'র ফলে লাল, কমলালেবু প্রভৃতি সাতটি বর্ণ আকাশে দেখা যায়। জলকণাগুলোর ইতস্ততঃ অবস্থানের জন্যে সূর্য্যের প্রতিসৃত আলো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাতরকম রংও ছড়িয়ে প'ড়ে ধনুকের আকার প্রাপ্ত হয়। এইভাবে রামধনুর সৃষ্টি হয়।

রামধনুর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এই যে, উহা সর্ব্বদাই বৃষ্টির পরে রৌদ্র উঠ্‌লে দেখা যায়। শুক্‌না আকাশে কখনও রামধনু দেখা যায় না, তা' বোধহয় তোমরা লক্ষ্য ক'রেছ। রামধনুর নামকরণ কেন যে ঐ রকম হ'ল তা' বলা শক্ত, তবে তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, রামায়ণের রামচন্দ্রের সঙ্গে এই রামধনুর কোনও সম্পর্কই নেই।

সেলোফেন্

কমলপুর হাই স্কুলে প্রাইজ বিতরণ হ'য়ে গেল। তরুণ এইবার সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্ষ্ট হ'য়ে প্রমোশন পেয়েছিল ব'লে অনেকগুলো বই প্রাইজ পেল। বইগুলোর মলাটের ওপর এক রকম পাতলা চক্‌চকে স্বচ্ছ কাগজ লাগান।

তরুণ সবেমাত্র বইগুলো নিয়ে হলের বাইরে পা দিয়েছে, এমন সময় বিশ্বনাথ, ভবেশ, নীরেন প্রভৃতি বন্ধুরা তা'কে একেবারে ঘিরে ফেল্‌ল। "দেখি দেখি, কি কি বই পেয়েছ ?" —ব'লে নীরেন তরুণের হাত থেকে একটি বই কেড়ে নিল; ভবেশ আবার সেইটি নীরেনের হাত থেকে একেবারে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল! এই রকম টানাটানি এবং কাড়াকাড়ির ফলে একটি বইএর মলাটের চক্‌চকে স্বচ্ছ কাগজটি ফড়াৎ ক'রে খানিকটে ছিঁড়ে গেল!

ভবেশ ব'লে উঠ্‌ল—"এই-যাঃ! বইখানার এমন সুন্দর মলাটটি ছিঁড়ে গেল!"

বাধা দিয়ে নীরেন বল্‌ল—"হ্যাঁ···ভা—রী ত এক টুক্‌রা সেলোফেন্—তা'র জন্যে আবার এত চিন্তা!"

"সেলোফেন্! সে আবার কি জিনিস নীরেন? কৈ আমরা ত তা'র নামও শুনি নি!"—ভবেশ বল্‌ল।

বিশ্বনাথও একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"সেলোফেন্ কা'কে বলে, নীরেন?"

এভাবে নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে বন্ধুরা সকলেই সাগ্রহে সেই ছেঁড়া মলাটের কাগজটি হাত দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

... ...

এই রকম সেলোফেন্ কাগজের মলাট-লাগান বই তোমরাও অনেক দেখে থাক্‌বে, কিন্তু সেই কাগজের নাম যে 'সেলোফেন্' তা' বোধহয় ভবেশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মত তোমাদেরও জানা নেই। সেলোফেন্ কি, কি জিনিসের সাহায্যে এবং কি ভাবে তৈরী হয়—সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'চার কথা বল্‌ছি।

সেলোফেন্ সাধারণ কাগজের মত এক প্রকার কাগজ। তবে সাধারণ কাগজ যে ভাবে তৈরী হয় সেলোফেন্ সে উপায়ে তৈরী হয় না। উহা একটি রাসায়নিক জিনিস, রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত। সেলোফেন্ প্রস্তুত কর্‌তে প্রধানতঃ সেলুলোজের প্রয়োজন। এই সেলুলোজ,—কাঠ বা কাঠের গুঁড়া, খড়, তূলা, সূতা প্রভৃতিতে বহুপরিমাণে আছে; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সেই সকল

জিনিসের মধ্যেও, সেলোফেন্ প্রস্তুত করার কাজে কাঠ বা কাঠের গুঁড়া এবং তূলাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী। তা' ছাড়া কাঠ এবং তূলা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। আবার কাঠের মধ্যে পপ্‌লার (Poplar), ফার্ (Fir), বার্চ্চ (Birch), স্প্রুস্ (Spruce) প্রভৃতি গাছের কাঠ বা কাঠের গুঁড়াতেই সেলুলোজ্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেই সকল কাঠের গুঁড়া, তূলা প্রভৃতি প্রথমে ভাল ক'রে পরিষ্কার করা হয়; পরে ঔষধপত্রের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে গলিয়ে ফেলে নাইট্রো-সেলুলোজ্ নামক একটি পদার্থ পাওয়া যায়। সেই নাইট্রো-সেলুলোজ্ —ইথার এবং অ্যাল্‌কোহল্ নামক দুটি তরল রাসায়নিক জিনিসের সঙ্গে সংমিশ্রিত ক'রে পরিষ্কার করা হয়; তারপর কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। কিছুদিন থাকার পরে সেই তরল পদার্থ চট্‌চটে আঠার মত হ'য়ে পড়ে। তখন ঐ পদার্থটি খুব শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে নীচের দিকে চেপে একটি চওড়া ও খুব সরু ফাঁকের ভিতর দিয়ে গ্লিসারিন্‌পূর্ণ পাত্রের মধ্যে বা'র ক'রে দিলে তা' অত্যন্ত পাত্‌লা কাগজের আকার ধারণ করে। সেই কাগজ খুব চওড়া রীল্ (Reel) অথবা মাকুতে জড়িয়ে রাখা যায়। উহারই নাম সেলোফেন্।

সাধারণ কাগজের তুলনায় সেলোফেন্ দেখ্‌তে খুব

চক্‌চকে, পাতলা, অথচ শক্ত। সেলোফেনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা খুব স্বচ্ছ—যেন কাচ। সাধারণ কাগজে অনেক রকম রং করা যায় না; কিন্তু সেলোফেনে বহু প্রকারের রং করা যায়। সেলোফেনে ছাপার কাজও চলে। এই সকল কারণে জিনিসপত্র মোড়ার কাজে সাধারণ কাগজের পরিবর্ত্তে সেলোফেন্ ব্যবহার করা যায়।

আজকাল বই, ঔষধপত্রের বাক্স, সিগারেটের টিন, কৌটা, বোতল প্রভৃতি মোড়ার কাজে সেলোফেন্ বহুপরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ কাগজের তুলনায় সেলোফেনের দাম কিছু বেশী, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সেলোফেন্ ব্যবহার করা হয়, কারণ সেলোফেনে মোড়া হ'লে জিনিসপত্র ভারী সুন্দর দেখায়। রঙ্গীন কাগজের ফুলের মত নানারকম রঙের সেলোফেন্ হ'তে নানাবর্ণের ফুলও তৈরী করা হয়। আবার আজকাল ইউরোপে এবং আমেরিকাতে মেম-সাহেবরা গরম-কালে রঙ্গীন সেলোফেনের হাল্কা পরিচ্ছদও প'রে থাকেন।

সেলোফেন্, ইউরোপে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্তও সেলোফেন্ প্রস্তুত হয় না, তবে ভবিষ্যতে হ'তে পারে। সেলোফেন্ প্রস্তুত করার জন্যে কাঠ বা কাঠের গুঁড়া এবং তূলা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আকাশ-ফটোগ্রাফী

লোকজন, ঘরবাড়ী, গাছপালা প্রভৃতির ফটোগ্রাফ্ অথবা ছবি তোমরা সকলেই দেখে থাক্‌বে এবং কি ভাবে এই সকল ফটোগ্রাফ্ তোলা হয় তা'ও তোমরা অনেকেই জান। আবার, তোমাদের মধ্যে হয়তো কা'রও কা'রও ক্যামেরা (Camera) বা ফটোগ্রাফ্ তোলার যন্ত্র আছে। তা'র সাহায্যে তোমরা নানা বস্তুর ছবি তুলে থাক। তোমরা যে ভাবে ছবি তুলে থাক তা' অতি সাধারণ। আজকাল ঘরবাড়ী, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতির ছবি এই সাধারণভাবে না তুলে আকাশ থেকে তোলা হয়। তোমরা হয়তো এই রকম আকাশ-ফটোগ্রাফ্ দেখে থাক্‌বে। কি ক'রে আকাশ-ফটোগ্রাফ্ তোলা হয় এবং বর্ত্তমানে তা'র প্রয়োজনীয়তাই বা কি সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে আকাশ থেকে ছবি তোলায় কত সুবিধা তা' সম্যক্ বুঝা গিয়েছিল। এই যুদ্ধে নানাদেশের এরোপ্লেন্-চালকগণ শুধু যে আকাশ থেকে বোমা ফেলে শত্রুর নগরসমূহ ধ্বংস করার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে আকাশে লড়াই

করত তা' নয়; পরন্তু যাতে ক'রে তাদের নিজেদের ছবি তোলার এরোপ্লেন্‌গুলো শত্রুপক্ষের কামান, সৈন্য-সমাবেশ ও সৈন্যদের অবস্থিতি এবং গতিবিধির ফটো নির্ব্বিঘ্নে তুল্‌তে পারে সেজন্যেও তা'রা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাকৃত। যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেনের সাহায্যে ছবি তুলে দেখা গেল যে, ক্যামেরার লেন্স্ (Lens) অথবা চোখ কখনও কখনও এমন সব ছবি তুল্‌ত যা' আমাদের সাধারণ চোখে আমরা দেখ্‌তে পাই নে। এইভাবে আকাশ থেকে ছবি তোলার সময়ে নীচেকার বিষয়-বস্তুর ছায়া খুবই প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ ক'রে গবেষণা করার জিনিস। কারণ, যদি একটি কামান গাছের ডালপালা, পাতা প্রভৃতির আড়ালে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় তা'হ'লে এই রকম অবস্থায় ঐ কামানটিকে সাধারণ চোখে দেখা যায় না। আর এরোপ্লেন্ থেকে সাধারণভাবে ছবি তুল্‌লেও বুঝা যায় না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, অতি সকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সূর্য্য একদিকে হেলে পড়ে সে সময় ছবি তুল্‌লে ঐ গুপ্ত কামানের লম্বা ছায়া পাওয়া যায় এবং তখন বুঝা যায় কামানটি কোথায়, কি ভাবে আছে!

ঐইভাবে মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের সাহায্যে ছবি তুলে অনেক সুবিধা হয়েছিল। যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে, কোন

দেশের ম্যাপ অথবা মানচিত্র তৈরী কর্‌তে গেলে এরোপ্লেনের সাহায্যে করাই খুব সুবিধাজনক; তা'হ'লে আর পূর্ব্বেকার মত বহুদিন ধ'রে মাপ-জোখ বা জরীপ করার প্রয়োজন হয় না।

আকাশ-ফটোগ্রাফীর জন্যে প্রথম প্রথম যে সকল ক্যামেরা ব্যবহার করা হ'ত সেগুলো সাধারণ ক্যামেরার মতই ছিল। প্রথম প্রথম ফটোগ্রাফারকে নিজ হাতে ক্যামেরা চালাতে হ'ত, জমি থেকে এরোপ্লেনের উচ্চতা মাপ্‌তে হ'ত, সময় ঠিক কর্‌তে হ'ত এবং ছবি তোলার সকল কাজই ফটোগ্রাফারকে কর্‌তে হ'ত। কিন্তু তা'তে বহুসংখ্যক ছবি তোলা সম্ভবপর হ'ত না এবং এই ভাবে তোলা ছবি প্রায়ই নির্ভুলও হ'ত না।

আকাশ-ফটোগ্রাফী এবং ক্যামেরা সম্বন্ধে ক্রমশঃ বহু গবেষণা ও বহু পরীক্ষা চল্‌তে লাগ্‌ল। কি ক'রে একেবারে ঠিক ও নির্ভুল ছবি তোলা যায় সে সম্বন্ধেও বহুরকম চেষ্টা করা হ'ল, যা'র ফলে আজকালকার আধুনিকতম এরোপ্লেন্‌-ক্যামেরা তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ-ফটোগ্রাফীর জন্যে আজকাল এরোপ্লেনে যে প্রকার ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় তা' সম্পূর্ণ আপনা হ'তেই কাজ করে—ইলেক্‌ট্রীকে চলে। আজকাল এই রকম ক্যামেরা ব্যবহার করার জন্যে ছবি তোলা, ছবির ফিল্ম (Film) বদ্‌লান প্রভৃতি সকল কাজই আপনি

হয়—ফটোগ্রাফার্‌কে আর এই সকল নিয়ে ব্যস্ত থাকৃতে হয় না। আকাশ-ফটোগ্রাফীর জন্যে আজকাল বহু রকমের বিশেষ বিশেষ প্লেট্ (Plate) এবং ফিল্ম তৈরী করা হচ্ছে।

আকাশ-ফটোগ্রাফীর ক্যামেরাতে সময়, উচ্চতা, কতগুলো ছবি তোলা হ'ল প্রভৃতি ঠিক করার জন্যে নানাপ্রকার যন্ত্র লাগান থাকে। এই যন্ত্রগুলোও আপনিই কাজ করে ব'লে প্রতি ছবিতে কত সময় লাগে এবং তা' কত উঁচু থেকে তোলা হয়েছে, ছবির নম্বর প্রভৃতি আপনিই লেখা হ'য়ে যায়! একখানা ছবি তোলা হ'লে পরবর্ত্তী ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা আপনা হ'তেই প্রস্তুত হ'য়ে যায়! একবার ক্যামেরাতে ফিল্ম ভর্ত্তি কর্‌লে প্রায় একশ' খানা ছবি তোলা যায়! ছবি তোলার সময়ে এরোপ্লেন্ বাঁকা হ'লে অথবা একদিকে হেলে পড়্‌লে চল্‌বে না—এই সময়ে এরোপ্লেন্ সমান থাকা চাই। ছবি তোলার সময়ে এরোপ্লেন্ যা'তে সমান থাকে সেইজন্যে ছবি তোলার দুই সেকেণ্ড আগে ক্যামেরা থেকে আপনিই একটা আলো এরোপ্লেন্-চালকের সাম্‌নে জ্বলে' ওঠে এবং সে তখন এরোপ্লেন্‌খানাকে সমান রাখ্‌তে চেষ্টা করে।

তোমরা হয়তো জান যে ছবি তোলার সময়ে ক্যামেরা স্থির এবং নিশ্চলভাবে ধ'রে রাখ্‌তে হয়—ক্যামেরা একটু ন'ড়ে

গেলেই ছবি একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়। এরোপ্লেন্ থেকে ছবি তোলার সময়ে যদিও এরোপ্লেন্খানা চল্তে থাকে এবং তা'র সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাও নড়্তে থাকে, তা'হ'লেও এখানে ছবির কোনও প্রভেদ হয় না। কারণ অধিকাংশ ছবিই প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচু থেকে তোলা হয়, আবার কখনও বা তা'র চেয়েও উঁচু থেকে তোলা হয়! এত উঁচুতে এরোপ্লেন্ চল্তে থাক্লেও মাটি অথবা পৃথিবী থেকে মনেই হয় না যে, এরোপ্লেন্-খানা চল্ছে; সুতরাং ছবি ঠিকই ওঠে। এরোপ্লেন্-চালককে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ্তে হয় যা'তে ক'রে এরোপ্লেন্খানা ছবি তোলার সময়ে সমানভাবে চলে এবং এরোপ্লেনের গতি যেন ঠিক একই রকম থাকে—কখনও আস্তে, কখনও দ্রুত হ'লে ছবি ভাল উঠ্বে না।

ছবি তোলার পরে ছবি ডেভেলপ্ (Develop) অথবা তৈরী করা, ছাপা প্রভৃতি কাজ সাধারণ ফটোগ্রাফীর মতই হয়।

আকাশ-ফটোগ্রাফীর সাহায্যে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের ম্যাপ-গুলো পরিশোধিত করা হচ্ছে। বৃটেনের অনেক ম্যাপ তোলা হয়েছে আকাশ ফটোগ্রাফীর সাহায্যে। আগে যে ভাবে দেশের ম্যাপ অথবা মানচিত্র তৈরী করা হ'ত তা'তে কয়েক বছর লেগে যেত, কিন্তু আজকাল আকাশ-ফটোগ্রাফীর

সাহায্যে অতি শীঘ্রই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা' তৈরী হ'য়ে যায়।

আর্কিয়োলজী (Archœology) অথবা প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে আকাশ-ফটোগ্রাফী বিশেষভাবে জড়িত। আকাশ-ফটোগ্রাফীর সাহায্যে আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের অনেক সুবিধা হয়েছে। আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ছবি তোলার যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতীতকালের সভ্যতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। পুরাণ রাস্তা, মাটির নীচেকার বাড়ী, দুর্গ প্রভৃতি খুঁজে বা'র করার কাজে আকাশ-ফটোগ্রাফী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে জমির উপরিভাগ সামান্য অসমান বা অসমতল হ'লে তা'র ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে তা' ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য একপাশে হেলে পড়ে তখন ছবি তুল্‌লে ঐ সকল উঁচু-নীচু স্থানের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে এবং আকাশ-ফটোতে তা' কাল কাল দাগের মত দেখায়। এই নিয়মে অনেক সমাধি, কবর-স্থান এবং দুর্গ প্রভৃতি খুঁজে বা'র করা হয়েছে। যদিও তা'রা ঐ সকল স্থানে শত শত বছর ধ'রে ছিল এবং লোকে তাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জান্‌ত না!

মাটির নীচে পোতা দেওয়াল, বাড়ী, ঘর প্রভৃতি বেশ

অদ্ভুত এবং মজার উপায়ে খুঁজে পাওয়া যায়। একবার এক ভুট্টাক্ষেতে কৃষক এবং অন্যান্য অনেকেই কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছিল যে, ঐ ক্ষেতের এক অংশের ভুট্টা অপর অংশের ভুট্টা অপেক্ষা অনেক শীঘ্র পাক্‌তে আরম্ভ করে। কেন যে এই রকম হয় তা' বহুদিন পর্য্যন্ত বুঝা যায় নি।

শেষে একদিন ঐ ক্ষেতের ফটো আকাশ থেকে তোলা হ'ল। এখন, পাকা ভুট্টার রং হল্‌দে এবং কাঁচা ভুট্টার রং সবুজ ব'লে ফটোতে এই দুই রকম রং আলাদা আলাদা দেখায়। আকাশ থেকে ছবি তুলে দেখা গেল যে, হল্‌দে এবং সবুজ রঙের মধ্যে বেশ পরিষ্কার একটা দাগ রয়েছে; অর্থাৎ ঐ ক্ষেতের খানিকটা অংশের ভুট্টা একেবারে একটানা পাকা এবং খানিকটা অংশের ভুট্টা একটানা কাঁচা! আকাশ-ফটোগ্রাফীর বিশেষজ্ঞগণ ঐ রকম ছবি দেখে চিন্তা ক'রে মত প্রকাশ কর্‌লেন যে, ঐ ক্ষেতের নীচে বাড়ী-ঘর আছে। তাঁরা আরও বল্‌লেন যে, মাটির নীচেকার ঘরের দেওয়াল অথবা ছাদ যেখানে আছে সেখানকার ভুট্টাগাছের শিকড় বহুদূর নীচে যেতে পারে না, সেইজন্যে অন্যান্য স্থানের ভুট্টা-গাছের তুলনায় মাটি থেকে জল কম পায় ব'লেই তা'রা শীঘ্র পেকে যায়। কিন্তু ক্ষেতের যে সকল অংশের নীচে এই রকম দেওয়াল বা ছাদ নেই সেখানকার ভুট্টাগাছের শিকড়

বহুদূর নীচে যায় এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত মাটি থেকে রস টান্‌তে পারে ব'লেই শীঘ্র পাকে না।

এইভাবে আকাশ-ফটোগ্রাফীর সাহায্যে মাটির নীচেকার চাপা-পড়া সহর, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি আবিষ্কার করা এখন খুবই সহজ হয়েছে। আকাশ-ফটোগ্রাফী না থাক্‌লে এই রকম ক'রে আবিষ্কার করা সম্ভবপর হ'ত না।

শুধু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নয়, পরন্তু সমুদ্রের তলদেশস্থ জীব-জন্তু বা সেখানকার দৃশ্যাবলীও আকাশ-ফটোগ্রাফীর সাহায্যে জানা যায়।

এই উপায়ে আবিষ্কারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আকাশ-ফটোগ্রাফীর সাহায্যে মানবজগতের বহু রকম কল্যাণ সাধিত হবে।

সী-ড্রোম্‌

তোমরা খুব সম্ভবতঃ “এরোড্রোম্‌” (Aerodrome), “এয়ার্‌-পোর্ট” (Air-port) অথবা বিমান-বন্দরের নাম শুনে থাক্‌বে। তোমাদের মধ্যে যা’রা সহরে বাস কর তাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো এরোড্রোম্‌ দেখেছও। যেমন জাহাজের জন্যে বন্দর থাকে তেমনই এরোপ্লেনের জন্যেও বন্দর আবশ্যক। এই রকম বন্দরের নাম “এরোড্রোম্‌” (Aerodrome)। এরোপ্লেন্‌ ওঠা নামা, রাত্রিতে থাকার স্থান, পেট্রোল ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা প্রভৃতি এরোপ্লেন্‌ যাতায়াতের সকল রকম ব্যবস্থা এরোড্রোমে থাকে। সী-ড্রোম্‌ (Seadrome) একটি ভাসমান এরোড্রোম্‌ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এরোড্রোম্‌ স্থলের উপর তৈরী করা হয়, কিন্তু সী-ড্রোম্‌ সমুদ্রের উপর অবস্থিত; এইজন্যেই তা’র নাম ঐরকম রাখা হয়েছে। তা’ না হ’লে এরোড্রোম্‌ এবং সী-ড্রোমের মধ্যে আর কোনও বিশেষ পার্থক্য নেই। সী-ড্রোম্‌ জিনিসটির বিস্তারিত বিবরণ এবং সী-ড্রোমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক দেশেই হাজার হাজার মাইলব্যাপী বিমানপথ স্থাপিত হয়েছে। এই সকল পথে এরোপ্লেন্‌

নিয়মিতভাবে যাত্রী, মালপত্র ও ডাক নিয়ে যাতায়াত করে; কিন্তু অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগর অথবা এই রকম বিস্তৃত সমুদ্রের উপর দিয়ে কোনও বিমানপথই এখনও পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নি। অবশ্য নানাপ্রকার বিশেষভাবে প্রস্তুত এরোপ্লেনে অনেক বৈমানিক বিভিন্ন পথে অ্যাট্‌ল্যান্টিকের উপর দিয়ে বহুবার উড়ে গিয়েছেন, কিন্তু তা'সত্ত্বেও অ্যাট্‌ল্যান্টিকের উপর দিয়ে নিয়মিত-ভাবে যাত্রী বা ডাকবাহী বিমান চলাচলের পথ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অ্যাট্‌ল্যান্টিকের উপর দিয়ে বিমানপথ স্থাপিত না হওয়ার কারণ, অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগর প্রায় ৩০০০ মাইল বিস্তৃত। বর্ত্তমানে—এমন কি, এখন হ'তে দশ, বিশ বছর পর্য্যন্তও একেবারে না থেমে ৩০০০ মাইল যাওয়া সাধারণ এরোপ্লেনের পক্ষে অসম্ভব। তা'র কারণ ৩০০০ মাইল পথ যেতে এত পেট্রোল্ প্রয়োজন হবে যে, সেই পরিমাণ তেলেই এরোপ্লেন্‌খানা প্রায় ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে এবং যাত্রী বা মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে সামান্যই স্থান সঙ্কুলান হবে। তা' ভিন্ন এই কাজের জন্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং নিরাপদ্ এরোপ্লেন্ এখনও তৈরী হয় নি।

কি ক'রে অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান-পথের এই প্রকার অসুবিধা দূর করা যায় তা'ই নিয়ে এড্‌ওয়ার্ড আর্ম্মষ্ট্রং (Edward Armstrong) নামক একজন আমেরিকান্

মাথা ঘামাতে লাগ্‌লেন এবং পরে তিনি অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের উপর সী-ড্রোম্ তৈরী করার উপায় উদ্ভাবন কর্‌লেন। তিনি যে ভাবে সী-ড্রোম্ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন তা' সম্পূর্ণ কাজের উপযোগী। কিন্তু যে সময়ে তিনি তাঁর পরিকল্পনা প্রচার কর্‌লেন ঠিক সেই সময়েই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা এবং ক্ষতি হওয়াতে গভর্ণমেন্ট্ থেকে এই কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নি। সেইজন্যে এখন পর্য্যন্তও কোনও সী-ড্রোম্ তৈরী করা হয় নি।

একটি সী-ড্রোম্ তৈরী কর্‌তে প্রায় ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় নয় কোটি টাকা লাগ্‌বে! তা' ছাড়া একটি বা দুটি সী-ড্রোম্ তৈরী কর্‌লে চল্‌বে না—অন্ততঃ আটটি সী-ড্রোম্ তৈরী কর্‌লে তবে সত্যিকারের কাজ হবে। এই আটটি সী-ড্রোম্ তৈরী কর্‌তে তা'হ'লে প্রায় ৫২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭২ কোটি টাকা লাগ্‌বে! সুতরাং বুঝ্‌তেই পার্‌ছ আটটি সী-ড্রোম্ তৈরী কর্‌তে কত টাকার প্রয়োজন এবং কোনও গভর্ণমেন্টই হঠাৎ এত অর্থ ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত নহেন।

ইউরোপ থেকে আমেরিকা যেতে হ'লে অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রায় ৩০০০ মাইল পথ যেতে হয়।

এই ৩০০০ মাইল পথে প্রতি ৩৮০ মাইল অন্তর আটটী সী-ড্রোম্ স্থাপিত হ'লে ইউরোপ থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিমান-পথে বিশেষ কোনও অসুবিধা থাক্‌বে না এবং এই পথে নিয়মিতভাবে এরোপ্লেন্ যাতায়াত কর্‌তে পার্‌বে। আর ৩৮০ মাইল পথ যেতে খুব সামান্যই পেট্রোল্ প্রয়োজন হয়;— সুতরাং যাত্রী, মালপত্র এবং ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রচুর স্থান থাক্‌বে।

মাঝ-সমুদ্রে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরী করার কল্পনা ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক আবিষ্কারকের মাথায় এসেছিল। কিন্তু সমুদ্রের নানাপ্রকার বিপদ্—বিশেষতঃ, ঝড়-তুফানের সময়কালীন বহু রকমের দুর্ঘটনার জন্যে এই প্রকার কৃত্রিম দ্বীপের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু প্রায় পনের বছর ধ'রে বহুরকম গবেষণা এবং পরীক্ষার পরে সী-ড্রোমের পরিকল্পনা ঠিক করা হয় এবং বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকার সী-ড্রোম্ নিরাপদ্ হবে এই রকম মত প্রকাশ করেছেন।

তোমরা হয়তো মনে কর্‌ছ যে, সী-ড্রোম্ একটি জাহাজ ভিন্ন আর কিছুই নয়—কিন্তু তা' নয়। সী-ড্রোম্ সাধারণ জাহাজের চেয়েও বড়। ইহা একটি উন্মুক্ত কাঠামে তৈরী এবং সমুদ্রের নীচে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সী-ড্রোমের ডেক্ অর্থাৎ উন্মুক্ত উপরিভাগ সমুদ্রের জলের লেভেল্ (level)

বা সমতা থেকে ৭০ ফুট উঁচু ও ১১০০ ফুট লম্বা। এই ডেক্ আকারে অনেকটা হাঁসের ডিমের মত অর্থাৎ মাঝখানে খুব চওড়া এবং ছু'পাশে ক্রমশঃ সরু—মাঝখানে প্রায় ৩৪০ ফুট এবং ছু'ধারে ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ১৮০ ফুট চওড়া।

বত্রিশটি 'বয়া' দিয়ে সী-ড্রোম্‌টিকে খাড়া রাখা হয়। এই বয়াগুলো ডেকের সঙ্গে ইস্পাতের এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত লম্বা থামের দ্বারা আট্‌কান থাকে। বয়াগুলো এমনভাবে লাগান থাকে যে, সমুদ্রের ঢেউতে সী-ড্রোমে বিন্দুমাত্রও দোলানি বা কাঁপুনী হয় না—সম্পূর্ণ স্থির থাকে। ঢেউ এসে সী-ড্রোমের গায়ে বা তা'র উপরে আছাড় খায় না বা ভেঙ্গে যায় না—ঢেউগুলো সী-ড্রোমের নীচেকার থামগুলোর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। যাতে ঝড়-বাতাসেও কোনও ক্ষতি না করতে পারে এজন্যে সমস্ত সী-ড্রোম্‌টি ষ্ট্রীম্-লাইন (Stream-line) করা হয় অর্থাৎ বায়ু-নিবারকভাবে তৈরী করা হয়। এই রকম করার ফলে সী-ড্রোম্‌টি সমুদ্রের ঢেউ অথবা ঝড়-তুফান থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হয়। সমস্ত সী-ড্রোম্‌টির ওজন প্রায় ১৭৫০০ টন অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ মণ! এরোপ্লেন্ এসে নাম্‌বার জন্যে সী-ড্রোমের উপর যে সমতলভূমি থাক্‌বে তা'র আয়তন ৬ একর (Acre) অর্থাৎ প্রায় ১২ বিঘা। সী-ড্রোম্‌টি একটি ১৫০০ টন অর্থাৎ প্রায় ৪২ হাজার মণ

ওজনের নঙ্গরের সঙ্গে আবদ্ধ থাক্‌বে। সী-ড্রোমের কোনও অংশ যদি মেরামত করার প্রয়োজন হয় সেইজন্য সী-ড্রোমের ওপরেই কারখানা এবং মিস্ত্রি রাখা হবে।

সী-ড্রোম্ তৈরী হ'লে তা'র পরেও অনেক রকম ব্যবস্থা করা দরকার এবং তা'র জন্যেও বহু অর্থ প্রয়োজন। যা'তে এরোপ্লেন্ স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা কর্‌তে পারে তা'র জন্যে সমস্ত ডেক্‌টিকে শক্তিশালী বিজ্‌লী বাতি দিয়ে আলোকিত রাখ্‌তে হবে—লোকজন, কর্ম্মচারী অনেকই নিযুক্ত কর্‌তে হবে। আর এরোপ্লেনে পেট্রোল ভর্ত্তি করার সম্যক্ ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে এবং বেতারের ঘাঁটীও থাক্‌বে। এই সকল ব্যবস্থার জন্যে বহু অর্থব্যয় হবে। কিন্তু একবার সী-ড্রোম্‌গুলো এবং তা'তে এই সকল ব্যবস্থা স্থাপিত হ'লে অ্যাট্‌ল্যান্টিকের উপর দিয়ে এরোপ্লেন্ যাতায়াতের এত সুখ-সুবিধা হবে যে, তা' ইতিপূর্ব্বে কখনও কল্পনা করা যায় নি। বিমানপথে যাতায়াতের সুবিধা এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেক সী-ড্রোম্ থেকে বেতারে খবর পাঠান হবে। প্রত্যেক সী-ড্রোম্ থেকে খুব শক্তিশালী আলোর রেখা আকাশের দিকে দেখান হবে যাতে ক'রে দূর থেকেই এরোপ্লেন-চালক তা'র পথ ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, সী-ড্রোম্ স্থাপিত হ'লে ঐ পথে এরোপ্লেন্ চলাচল সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হবে।

ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার অপেক্ষাকৃত ছোট পথ আছে কিনা, এ সম্বন্ধে অনেক বৈমানিক পরীক্ষা ক'রেছেন এবং তা'র ফলে আয়র্‌ল্যাণ্ড (Ireland) থেকে নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড (Newfoundland) পর্য্যন্ত বিমানপথটি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই পথেও প্রায় ২০০০ মাইল অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের উপর দিয়ে যেতে হবে। এতদূর পথ একটানা যেতে যত পেট্রোল্ প্রয়োজন হবে তা'তেই এরোপ্লেনের সমস্ত জায়গা প্রায় ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে এবং যাত্রী বা ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশেষ স্থান সঙ্কুলান হবে না। সুতরাং এই পথও কোন কাজের হবে না।

ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার জন্যে আর একটি বিমানপথ আছে, এইটি হচ্ছে আয়র্‌ল্যাণ্ড থেকে ফ্যারোজ্ দ্বীপপুঞ্জ (The Faroes islands), সেখান থেকে আইস্‌ল্যাণ্ড (Iceland), সেখান থেকে গ্রীণল্যাণ্ড (Greenland)। এই পথে আজকাল কয়েকবার এরোপ্লেন্ যাত্রায়াত ক'রেছে এবং এই পথটিতে সমুদ্রের উপর দিয়ে একটানা লম্বা পাড়ি দিতে হয় না। কিন্তু এই পথটি এত উত্তরে অবস্থিত যে শীতকালের দুঃসহ ঠাণ্ডার জন্যে বারমাস এরোপ্লেন্ চলাচল করা অসম্ভব। সুতরাং এই পথটিও কোনও কাজের হবে না। এই সকল কারণে ইউরোপ থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিমানপথ স্থাপিত

করতে হ'লে অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের উপর সী-ড্রোম্ তৈরী করা ভিন্ন উপায় নেই এবং সেইজন্যে শীঘ্রই সী-ড্রোম্ স্থাপিত হ'তে পারে। শুধু অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগর ব'লে নয়, পরন্তু যেখানেই সমুদ্রের উপর দিয়ে লম্বা পাড়ি দিতে হবে সেখানেই সী-ড্রোম্ করতে হবে।

দক্ষিণ অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরে সী-প্লেনের জন্যে একটি

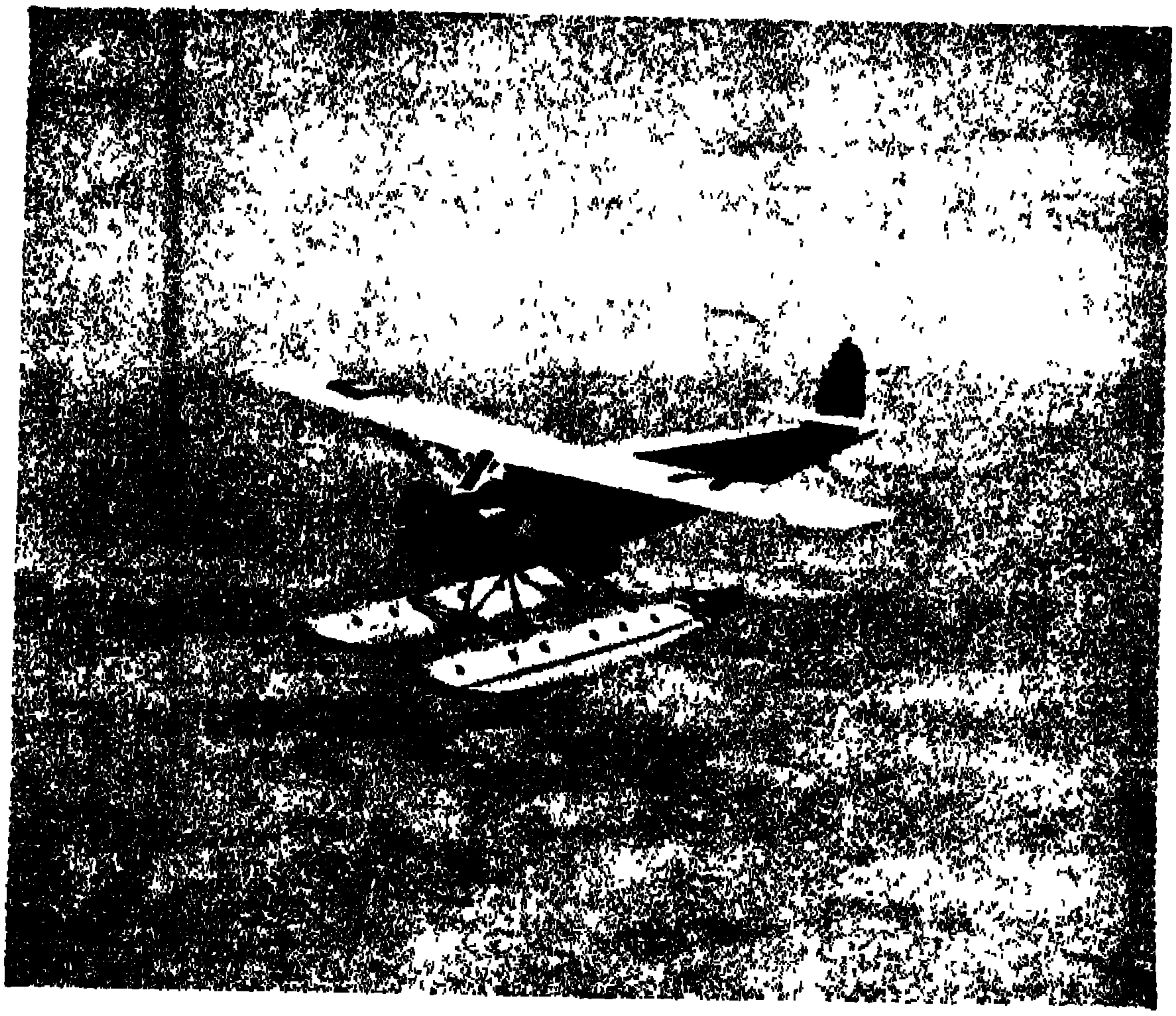

সী-প্লেন্

কৃত্রিম দ্বীপ ইতিপূর্ব্বেই স্থাপিত হয়েছে। সী-প্লেন্ (Sea-plane) এরোপ্লেনের মতই উড়োজাহাজ। তবে এরোপ্লেন্ শুধু

আকাশপথেই চল্‌তে পারে। কিন্তু সী-প্লেন্ এরোপ্লেনের মত আকাশপথে চল্‌তে পারে, আবার প্রয়োজন হ'লে জলের উপর দিয়ে জাহাজের মতও যেতে পারে। এই কৃত্রিম দ্বীপটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি সী-ড্রোম্ নয়—এইটি একটি সাধারণ জাহাজ। এই জাহাজটির নাম ওয়েষ্টফ্যালেন্ (Westphalen) এবং এই দ্বীপটি ব্রিটিশ গ্যাম্‌বিয়া (British Gambia) দেশের অন্তর্গত ব্যাথার্ষ্ট (Bathurst) নামক বন্দর এবং ব্রেজিল্ (Brazil) দেশের অন্তর্গত পার্ণাম্‌বুকো (Pernambuco) নামক বন্দরের মধ্যে অবস্থিত। এই জাহাজটিতে সী-ড্রোমের সকল রকম ব্যবস্থাই আছে—তা'তে এরোপ্লেন্ যাতায়াত করার পথ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্যে বেতার-আফিস আছে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ইলেক্‌ট্রীক্ আলো আছে, এরোপ্লেন্ মেরামত করার কারখানা আছে এবং পেট্রোল্ ভর্ত্তি করার ব্যবস্থাও আছে। এই কৃত্রিম দ্বীপবিশেষটি থাকার জন্যে জার্ম্মেণীর অন্তর্গত বার্লিন্ (Berlin) থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল্ দেশের অন্তর্গত রায়ো ডি জেনীরো (Rio de Janeiro) পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে যাতায়াত করা এখন খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। এই সকল কারণে মনে হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এরোপ্লেন্ অথবা সী-প্লেন্ যাতায়াতের সুবিধার জন্যে শীঘ্রই সী-ড্রোম্ তৈরী করা হবে।

মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক

পূজার ছুটীর পরে স্কুল খুলেছে। গোপেন পূজার সময়ে পাওয়া জামাটি গায়ে দিয়ে বই নিয়ে স্কুলে চল্‌ল। স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছাতেই নরেশ, ক্ষিতীশ, শঙ্কর প্রভৃতি সমপাঠীদের সঙ্গে তা'র দেখা হ'য়ে গেল। পূজার পরে দেখা, সুতরাং যথারীতি আলিঙ্গন করার পরে নরেশ গোপেনকে ব'লে উঠ্‌ল—"কি হে গোপেন, খুব যে সিল্কের জামা পরা হচ্ছে আজকাল!"

শঙ্কর এবং ক্ষিতীশও তা'র কথায় সায় দিয়ে বল্‌ল—"তা' আর কেন হবে না বল—গোপেনের ভাবনা কি, ওরা বড়লোক, সিল্কের জামা ওরা পর্‌বে না ত কে পর্‌বে!"

নরেশ এবং শঙ্করের এই রকম কথাবার্ত্তা শুনে একটু হেসে গোপেন উত্তর দিল—"তা' ভাই তোমরা যতই বড়লোক ব'লে ঠাট্টা কর না কেন, এই জামাটি কিন্তু সিল্কের নয়। এটি মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্কের তৈরী এবং দাম খুবই সস্তা।"

গোপেনের কথা শুনে শঙ্কর একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল—"মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক—দামে খুব সস্তা—সে আবার কি জিনিস ভাই! কৈ আমরা ত তা'র নাম পর্য্যন্তও শুনি নি!"

নরেশ এবং ক্ষিতীশ একটু অবাক্ হ'য়ে গোপেনের গায়ের পাঞ্জাবীটি হাত দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব'লে উঠ্‌ল—"তা'ই ত! মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক আবার কি রকমের সিল্ক!"

তাদের ঐরকম অবস্থা দেখে গোপেন বল্‌ল—"বাবার কাছে শুনেছি যে মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক সাধারণ সিল্কের মত নয়; এটি রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত সিল্ক। সাধারণতঃ যে সিল্ক-টুইল্ কাপড়ের সার্ট আমরা গায়ে দিয়ে থাকি, মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক সেই সিল্ক-টুইলেরই স্বজাতি।"

গোপেনের কথা শুনে নরেশ বল্‌ল—"এই ত আমার গায়ে সিল্ক-টুইলের জামা রয়েছে, তুমি তা'হ'লে বল্‌তে চাও যে, আমার এই জামা এবং তোমার ঐ জামা একই কাপড়ের তৈরী!"

গোপেন উত্তর দিল:—"নিশ্চয়ই তা'ই—তবে তোমার জামা মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ করা টুইল্ কাপড় থেকে তৈরী করা হয়েছে ব'লে ঐ কাপড়ের নাম সিল্ক-টুইল্ অথবা মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ টুইল্ (Mercerised Twill)। আর আমার জামা সাধারণ কাপড় থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত সিল্ক থেকে তৈরী হয়েছে ব'লে তা'র নাম মার্‌সিরাইজ্‌ড্‌ সিল্ক (Mercerised Silk)। আসলে কিন্তু এই দু'টি কাপড়ই একই রকমের—বাবার কাছে এই রকম শুনেছি।"

"তাই নাকি!"—ব'লে তা'রা সকলে পরস্পরের দিকে একটু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌ল।

... ...

নরেশ, ক্ষিতীশ, শঙ্কর প্রভৃতির মত তোমরাও অনেকে সিল্ক টুইল্ অথবা মার্‌সিরাইজ্‌ড্ টুইল্ এবং মার্‌সিরাইজ্‌ড্ সিল্কের জামা প'রে থাক্‌বে—দেখেছও। কিন্তু এই দু'টি কাপড় যে কি এবং কি ভাবে তৈরী হয় তা' খুব সম্ভব তোমরা জান না। মার্‌সিরাইজ্‌ড্ সিল্ক কি ভাবে তৈরী করা হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'চার কথা বল্‌ছি।

বহুকাল পূর্ব্বে—প্রায় ১০০ বছর আগে—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ মার্সার্ (John Mercer) নামক একজন জার্ম্মান্ রাসায়নিক, সাধারণ সূতা বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আস্‌লে কি ফল পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্‌ছিলেন। তিনি যে সকল রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা কর্‌ছিলেন, তাদের মধ্যে তরল এবং গাঢ় কষ্টিক্ সোডাও (Caustic Soda) ছিল। এই কষ্টিক্ সোডা ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপে ভিন্ন ভিন্ন রকম ফল দিয়েছিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, তূলার সূতা লম্বা লম্বা এবং চ্যাপ্টা এক প্রকার নল ভিন্ন আর কিছুই নয়। মার্সার্ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন যে, কষ্টিক্ সোডা তূলার সূতার উপর ঢেলে

দিলে সেই সূতা ফুলে উঠে ; মনে হয় যেন তুলার নলগুলো মোটা হ'য়ে উঠেছে। তিনি আরও লক্ষ্য কর্‌লেন যে, সূতা খুবই চক্‌চকে দেখায়, কিন্তু লম্বায় পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হ'য়ে যায়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্‌ (Thomas) ও প্রীভোষ্ট্‌ (Prevost) নামক আরও দু'জন রাসায়নিক, মার্সারের এই পরীক্ষাগুলো সম্বন্ধে গবেষণা ক'রেছিলেন, কিন্তু একটু নতুন প্রথায়। তাঁদের পরীক্ষা এবং গবেষণার সময়ে তরল কষ্টিক্‌ সোডা তুলার সূতার উপর ঢেলে দিলে সেই সূতা যা'তে আকারে পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হ'য়ে না যায়, সেইজন্যে সূতাগুলোকে একরকম যন্ত্রের সাহায্যে টেনে লম্বা ক'রে রাখা হয়েছিল। পরে কষ্টিক্‌ সোডা ধুয়ে ফেলার জন্যে প্রচুর পরিমাণে জল ঢেলে সূতাগুলো ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। সেইরকম করার ফলে সূতাগুলো পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছিল। অতঃপর এই প্রণালীতে তুলার সূতার উপর তরল কষ্টিক্‌ সোডা ঢেলে সূতা উজ্জ্বল করার প্রথা ক্রমশঃ উন্নত হ'তে লাগ্‌ল এবং তুলার সূতা অথবা সূতী-কাপড়ের উপর তরল কষ্টিক্‌ সোডা ঢেলে দিয়ে সেই সূতা বা কাপড়খানাকে টেনে রাখার বহুরকম যন্ত্র-পাতিও প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌ল। এইভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে সূতা বা সূতী-কাপড় উজ্জ্বল করার প্রথাকে তা'র আবিষ্কারক জন্‌

মার্সারের নামানুসারে মার্সিরাইজেশন্ (Mercerization) অথবা মার্সার্ প্রক্রিয়া বলা হয়।

ক্রমশঃই এই প্রক্রিয়া বহু পরিমাণে প্রচলিত হ'তে লাগ্ল। আজকাল এই প্রক্রিয়া এতই ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে যে, অধিকাংশ সূতী-কাপড় এবং সূতী-দ্রব্যাদি কলে প্রস্তুত করার পরে মার্সিরাইজ্ করা হয়। তা'তে সূতী-কাপড়, জামা প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা খুবই উজ্জ্বল হয় এবং অনেকটা সিল্কের মত দেখায়। সেইজন্যেই সেগুলোর নাম রাখা হয়েছে মার্সিরাইজ্ড্ সিল্ক্ অর্থাৎ মার্সার্ প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত সিল্ক্। তবে মার্সিরাইজ্ড্ সিল্ক যতই উজ্জ্বল হোক্ না কেন, আসল সিল্কের মত অত নরম এবং টেকসই হয় না। দূর থেকে মার্সিরাইজ্ড্ সিল্কের জামা দেখ্লে আসল সিল্কের জামা ব'লে ভুল হয়, কিন্তু কাছে গিয়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলে বেশ বুঝা যায় যে, মার্সিরাইজ্ড্ সিল্ক্ এবং আসল সিল্ক্ সম্পূর্ণ বিভিন্ন! অনেকেই সিল্ক্ টুইল্ কাপড়ের তৈরী সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি গায়ে দিয়ে থাকে। সেই সিল্ক্ টুইল্ মার্সিরাজ্ড্ টুইল্ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সিল্ক্ টুইল্ নাম শুনে প্রথমটা মনে হয় বোধ হয় সিল্ক্ থেকে প্রস্তুত টুইল্; কিন্তু আসলে তা' মার্সিরাইজ্ড্ টুইল্ কাপড়। সিল্কের সঙ্গে এই টুইল্ কাপড়ের কোনও সম্বন্ধ নেই।

মার্সিরাইজ্ড্ টুইল্ বা সিল্কের দাম সূতী-টুইল্ ও সূতী-কাপড়ের তুলনায় সামান্য বেশী; কিন্তু আসল সিল্ক্ অপেক্ষা খুবই সস্তা। এইজন্যেই সিল্ক্ টুইল্ এবং মার্সিরাইজ্ড্ সিল্কের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল ধুতি কাপড় ভিন্ন সার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতির কাপড় মার্সিরাইজ্ করা হয়।

মার্সিরাইজিং-এর মত বহুপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া বস্ত্রশিল্পে প্রয়োগ করা হয়। রসায়নের সহিত বস্ত্রশিল্প ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রসায়নের সাহায্যেই সাধারণ সূতী-কাপড় থেকে জল-নিবারক্ বা ওয়াটার-প্রুফ্ (Water-proof), অগ্নি-নিবারক অথবা ফায়ার-প্রুফ্ (Fire-proof) প্রভৃতি অনেকপ্রকার কাপড় প্রস্তুত এবং রং করা ও ছাপা হয়।

ভারতবর্ষে বহু সূতী-কাপড়ের কল আছে, কিন্তু সেগুলোতে মার্সিরাইজিং করার প্রথা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হয়নি। মাত্র অল্পসংখ্যক কলে এই প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে এবং সেইজন্যে আমাদের দেশে যে সকল সিল্ক্ টুইল্ বা মার্সি-রাইজ্ড্ সিল্ক্ দেখ্তে পাওয়া যায়, তা'র অধিকাংশই বিদেশ হ'তে আমদানী করা। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে বহু কাপড়ের কলেই মারসিরাইজিং প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে।

আবর্জ্জনার মূল্য

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে তা'রা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছ যে, প্রত্যেক বাড়ীর যত ময়লা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি একত্র ক'রে বাড়ীর সংলগ্ন অপরিষ্কার জমির একধারে ফেলে দেওয়া হয় এবং এই রকমে অনেক আবর্জ্জনা একত্র হ'লে তা'তে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। ঐ আবর্জ্জনার স্তূপে আগুন না লাগালেও তা'রা বৃষ্টিধারায় এবং রৌদ্রের তেজে ক্রমশঃ পচে এবং মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

আবার তোমাদের মধ্যে যা'রা সহরে বাস কর তা'রা বোধ হয় জান যে, সহরের প্রত্যেক বাড়ীর যত ময়লা, নোংরা বাজে জিনিস এবং আবর্জ্জনা—সমস্তই একত্র ক'রে প্রথমে বাড়ীতে একটা টবে রাখা হয় এবং পরে সেই টবের যত আবর্জ্জনা রাস্তার ডাষ্ট্-বিন্ (Dust-bin) অথবা ময়লা-ফেলা টবে ফেলে দেওয়া হয়। পরে মিউনিসিপ্যালিটির ঘোড়ার গাড়ী, অথবা মোটর-লরী এসে সেই সকল টবের আবর্জ্জনা নিয়ে যায়। এই রকমে সহরের যত ময়লা একত্র ক'রে তা'তে আগুন লাগিয়ে সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা হয়; অথবা সেই আবর্জ্জনা যন্ত্রপাতি এবং পাম্পের সাহায্যে প্রথমে নদী বা খালে এবং

পরে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। কখনও কখনও সেই আবর্জ্জনা দিয়ে সহরের নিকটস্থ নীচু এবং জলা জায়গা ভরাট করা হয়।

পল্লীগ্রাম বা সহরের আবর্জ্জনা যে মানুষের কোনও কাজে লাগ্‌তে পারে তা' বহুদিন পর্য্যন্ত কেউই ভাব্‌তে পারে নি। এতদিন লোকে মনে কর্‌ত 'আবর্জ্জনা আবার মানুষের কোন্ কাজে লাগ্‌তে পারে এবং আবর্জ্জনার আবার দামই বা কি!' কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এই আবর্জ্জনা থেকেই আজকাল অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এবং বর্ত্তমান যুগে আবর্জ্জনারও দাম হয়েছে! আবর্জ্জনা থেকে কি কি জিনিস পাওয়া যায় এবং আবর্জ্জনা মানুষের কি কাজে লাগ্‌তে পারে সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

আমরা প্রত্যহ রাস্তার ময়লা-ফেলা টবে কত জিনিস যে বাজে বা অকেজো ব'লে ফেলে দেই তা'র ঠিক নেই। কিন্তু ঐ সকল বাজে জিনিসের প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও জিনিস প্রস্তুত কর্‌তে দরকার হয়। এই রকম দশ-পনেরটা ময়লা-ফেলা টবের আবর্জ্জনা একত্র কর্‌লে দেখা যায় যে, তা'তে নেই এমন জিনিসই নেই—নানারকম ধাতুর টুক্‌রো থেকে আরম্ভ ক'রে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পর্য্যন্ত সব রকম জিনিসই তা'র মধ্যে আছে!

এই আবর্জ্জনার মধ্যে কি প্রকার জিনিস পাওয়া যেতে পারে তা'ই পরীক্ষা করার জন্যে ইংলণ্ডের বার্‌মিংহ্যাম্‌ (Birmingham) সহরের প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীর ময়লা-ফেলা টবের যত আবর্জ্জনা একত্র ক'রে দেখা গিয়েছিল যে, তা'তে চার আউন্স সোনা, ১৭০ আউন্স রূপা, সাত টন পিতল, দু'টন তামা, এক টন সীসা, দু'টন এলুমিনিয়ম্‌, তিন হন্দর টিন এবং সীসা-মিশ্রিত এক রকম ধাতু, দু'টন দস্তা এবং আরও বহুপ্রকার জিনিস আছে, এবং তাদের মোট মূল্য প্রায় ২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৭০০০ টাকা !

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে কি ক'রে এই আবর্জ্জনা থেকে ঐ সকল জিনিস কম খরচে উদ্ধার ক'রে সেগুলো আবার আমাদের কাজে লাগান যায়। তাঁদের চেষ্টার ফলে এখন অসাধ্য সাধন করা সম্ভবপর হয়েছে। এমন কি মল, মূত্র প্রভৃতি ময়লা যা সহরের ড্রেনের মধ্য দিয়ে নদী বা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা'ও আজকাল জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা' থেকে এক রকম ইট এবং টালি তৈরী হয়। আবার এই ময়লা ক্ষেতে সার দেওয়ার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

ময়লা-ফেলা টবে যত আবর্জ্জনা ফেলা হয় তা'র মধ্যে ছেঁড়া জামা-কাপড় এবং ছেঁড়া ন্যাকড়াই প্রধান। হিসাব

ক'রে দেখা গিয়েছে যে, ইংলণ্ডের সমস্ত ময়লা-ফেলা টবে প্রতি বছর যত ছেঁড়া পশমী জামা, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি ফেলে দেওয়া হয়, তা'র পরিমাণ প্রায় ১৯০০০ টন, অর্থাৎ প্রায় ৫৫০,০০০ মণ! এই পরিমাণ ছেঁড়া পশমী জামা, মোজা প্রভৃতি যদি ঐ ভাবে না ফেলে দেওয়া হয়, তা'হ'লে সেগুলো যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিষ্কার ক'রে, নতুন পশমের সঙ্গে মিশিয়ে, তা' থেকে আবার নতুন জামা, মোজা, সোয়েটার প্রভৃতি তৈরী করা যায়। এইভাবে ছেঁড়া পশমী জিনিসগুলো ব্যবহার করলে প্রতি বছর ১৯০০০ টন পশম বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় না! কাগজ এবং পোষ্টকার্ড প্রস্তুত করতে ছেঁড়া ন্যাকড়া লাগে।

এইরকমে আবর্জ্জনা থেকে যথাসম্ভব কাজের জিনিস বেছে নিয়ে, আবর্জ্জনার বাকী অংশ একত্র ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জ্বালানোর ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা'র সাহায্যে জল থেকে ষ্টীম বা বাষ্প প্রস্তুত করা হয়। সেই বাষ্পে 'ডায়নামো' চালান যায় এবং ডায়নামোর সাহায্যে ইলেকট্রিক্ উৎপন্ন হয়। আবর্জ্জনা জ্বালানোর পর যা' অবশিষ্ট থাকে তা' থেকে ইটের মত একরকম খুব শক্ত জিনিস পাওয়া যায় এবং সেগুলো রাস্তা প্রস্তুত করার কাজে লাগে। ইউরোপ এবং আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সহরে এই উপায়ে আবর্জ্জনাকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগান হয়।

এইবার, প্রধানতঃ কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে এই আবর্জ্জনাকে কাজে লাগান হয় সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি। প্রত্যেক বাড়ী বা রাস্তার ময়লা-ফেলা টবের যত আবর্জ্জনা একত্র ক'রে এক একটা বড় ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরের মধ্যে একরকম ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার সাহায্যে খুব জোরে বাতাস চালিয়ে দেওয়া হয় এবং তা'র ফলে ঐ আবর্জ্জনার মধ্যে যত ধূলা থাকে সে সমস্তই একটা ছোট দরজা দিয়ে বা'র হ'য়ে পাশের একটা ঘরে জমা হয়। সেই ধূলা ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর-লরীতে ক'রে নিয়ে গিয়ে সহরের নীচু জায়গাতে ফেলে দেওয়া হয়—যাতে সেই সকল জায়গা ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে উঠে। এইভাবে ধূলা আলাদা করার পরে ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত জিনিসপত্র আলাদা করা হয়। তোমরা বোধহয় চুম্বক লোহার নাম শুনেছ। আবর্জ্জনা থেকে ধূলা ঝেড়ে ফেলার পর খুব শক্তিশালী চুম্বক লোহা দিয়ে তা'র মধ্যকার সমস্ত ধাতুনির্ম্মিত জিনিস আলাদা ক'রে নেওয়া হয় এবং এই উপায়ে আবর্জ্জনা থেকে অনেক সময়ে সোনার আংটি, বোতাম, রূপার মেডেল, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনেক সময়ে অসাবধানতার ফলেই এই সকল জিনিস আবর্জ্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

আবর্জ্জনার মূল্য

আবর্জ্জনা থেকে জগতের কি উপকার হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ইউরোপের এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধ'রে চেষ্টা কর্ছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে ঐ সকল দেশের আবর্জ্জনা থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে। সে সব দেশের অনেক সহরের রাস্তায় 'ফুটপাথ' এবং বাড়ী তৈরী কর্তে যে টালি ও ইটের প্রয়োজন, আবর্জ্জনা থেকেই সেই ইট ও টালি প্রস্তুত হয়।

আমরা চুল বা নখ বড় হ'লে নাপিত দিয়ে কেটে ফেলি। কিন্তু চুল এবং নখ থেকেই রাসায়নিক ঔষধপত্রের সাহায্যে আজকাল অনেক রকম রাসায়নিক জিনিস ও ঔষধ তৈরী হচ্ছে! মানুষের চুল যে কোনও কাজে লাগ্তে পারে তা' এতদিন কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মেণীতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, মানুষের চুল থেকে পশম তৈরী করা যায় এবং সেই পশম ভেড়ার লোমে প্রস্তুত পশমেরই মত। এখন জার্ম্মেণীতে চুলকাটার দোকান থেকে প্রতিদিন রাশি রাশি চুল পশমের কারখানায় পাঠান হয় এবং যে চুল কিছুদিন পূর্ব্বেও আবর্জ্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হ'ত, তাই এখন মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে!

থার্ম্মোমিটার্

তোমরা খুব সম্ভবতঃ "থার্ম্মোমিটার্" কথাটি শুনেছ এবং থার্ম্মোমিটার্ কি জিনিস তা'ও বোধ হয় জান। কা'রও অসুখ বা জ্বর হ'লে থার্ম্মোমিটারের সাহায্যে শরীরের উত্তাপ দেখা হয় এবং তখনই থার্ম্মোমিটারের প্রয়োজন হয় তা' তোমরা লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে। কোনও বস্তুর উষ্ণতা নির্ণয় করা কিংবা কোনও জিনিস ঠাণ্ডা অথবা গরম তা' পরীক্ষা করা এবং কি পরিমাণ ঠাণ্ডা বা কি পরিমাণ গরম তা' পরীক্ষা করার কাজেও থার্ম্মোমিটার্ না হ'লে চলে না। থার্ম্মোমিটার্ যন্ত্রটি এতরকম কাজে প্রয়োজন হয় যে, বর্ত্তমান সভ্যজগতে এইটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু হ'য়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি, দু'টি থার্ম্মোমিটার্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়ই।

তোমরা হয়তো মনে কর্‌তে পার, থার্ম্মোমিটার্ না থাক্‌লেও হাতের স্পর্শেই যে কোনও বস্তুর উষ্ণতা ঠিক করা যায়—পল্লীগ্রামাঞ্চলে বৈদ্য অথবা কবিরাজ মহাশয়গণ এখনও থার্ম্মোমিটারের সাহায্য না নিয়ে শুধু হাতের নাড়ী টিপে জ্বর হয়েছে কিনা ব'লে দিতে পারেন। কিন্তু এই

ভাবে কোনও জিনিসের উত্তাপ অথবা মানুষের শরীরের উষ্ণতা নির্ভুলভাবে ঠিক করা যায় না। একটি অতি সহজ এবং সাধারণ পরীক্ষার দ্বারাই এই প্রকার ধারণার সত্যাসত্য প্রমাণ করা যায়।

তিনটি বাল্‌তি অথবা অন্য কোনও পাত্রে জল রাখ—প্রথমটিতে সাধারণ জল, দ্বিতীয়টিতে ঈষৎ উষ্ণ বা গরম

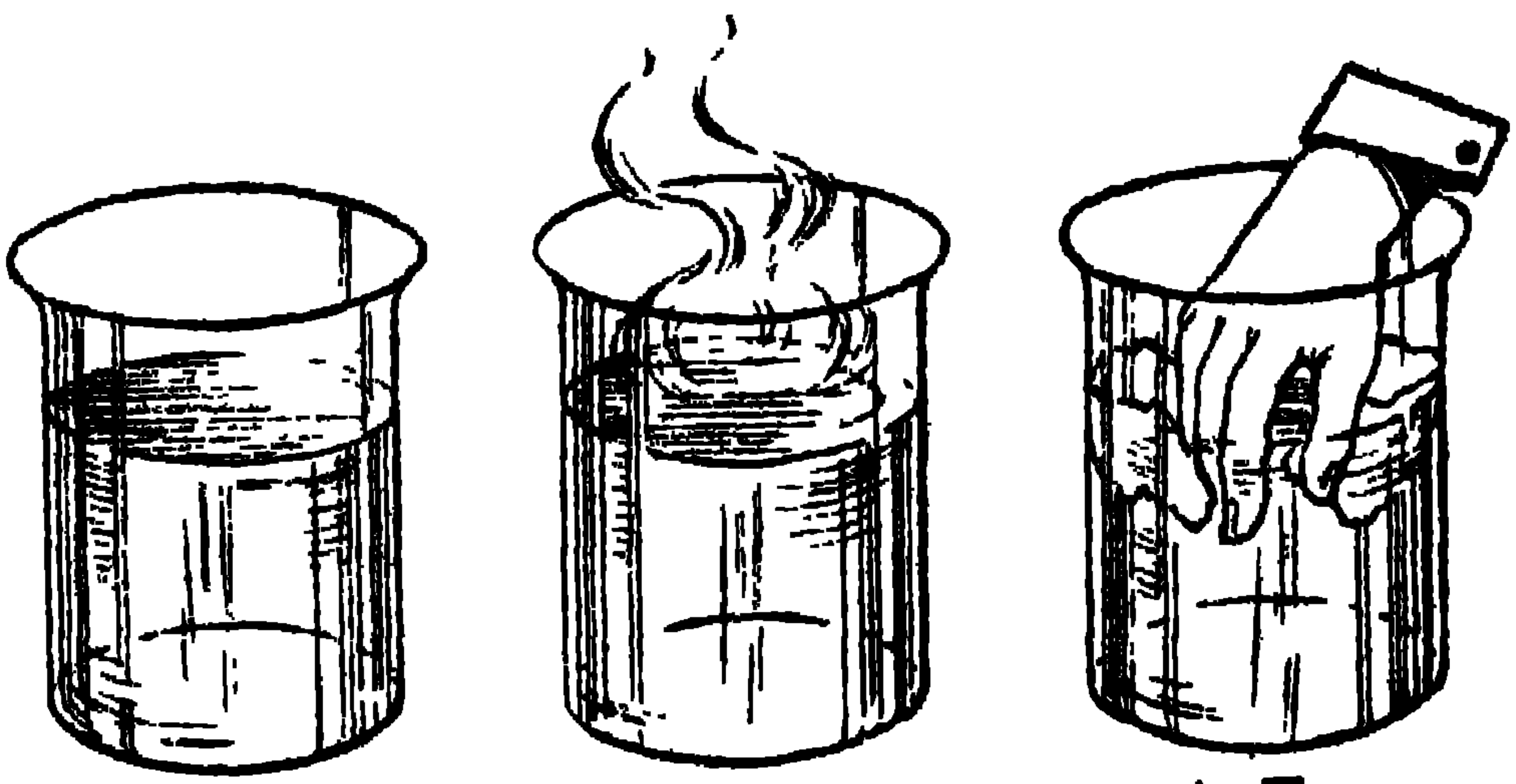

১নং ২নং ৩নং

জল এবং তৃতীয়টিতে বরফ জল। এইবার প্রথমে প্রথম পাত্রটিতে হাত ডুবাও, পরে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় পাত্রে হাত ডুবাও—দেখ্‌তে পাবে, তৃতীয় পাত্রটি ঠাণ্ডা জলে এবং দ্বিতীয়টি গরম জলে পূর্ণ। এখন প্রথমে তৃতীয় পাত্রে হাত ডুবিয়ে, হাত তুলে তখনই প্রথম পাত্রে হাত দাও এবং দেখ্‌বে যে প্রথম পাত্রের জল গরম ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রথমে দ্বিতীয় পাত্রে হাত রেখে, পুনরায় প্রথম পাত্রে হাত

দিলে, সেই একই জল ঠাণ্ডা ব'লে মনে হবে। এই পরীক্ষা হ'তেই বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌বে আমরা শুধু স্পর্শদ্বারা তাপের মাত্রা ঠিক কর্‌তে পারি না। আমাদের এই অক্ষমতার জন্যে এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করা প্রয়োজন, যা'র সাহায্যে তাপের পরিমাণ অথবা মাত্রা ঠিকভাবে মাপ করা যায়—যাতে কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

নানাদেশের নানা বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং বহু পরীক্ষার পরে তাঁ'রা আধুনিক প্রকারের থার্ম্মোমিটার্‌ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার কর্‌তে সক্ষম হয়েছেন; সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বল্‌ছি। তাঁ'রা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন যে, যে কোনও বস্তুকেই উত্তাপ দিলে অথবা গরম কর্‌লে সেই বস্তু আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার তামা, লোহা প্রভৃতির মত কঠিন বা শক্ত পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ উত্তপ্ত হ'লে আয়তনে অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁ'রা আরও লক্ষ্য কর্‌লেন, কঠিন অথবা তরল সকল রকম ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গরম কর্‌লে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আয়তনে বাড়ে। অনেক গবেষণার পরে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির কর্‌লেন, এই প্রকারে বর্দ্ধিত পরিমাণ দ্বারাই যে কোনও বস্তুর উত্তাপ মাপ করা যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে আধুনিক থার্ম্মোমিটার্‌ অথবা

তাপ-মান যন্ত্র প্রস্তুত করার মূলে পদার্থের এই রকম প্রসারণ রয়েছে।

একটি কাচের পাত্রে অল্প পরিমাণ "পারদ" নামক তরল ধাতু পূরে দেখা গেল ঐ পাত্রটির একটি বিশেষ দাগ পর্য্যন্ত পারদ বর্ত্তমান এবং ঐ পাত্রটিকে উত্তাপ দিলে তা'র ভিতরকার পারদ প্রসারিত হ'য়ে পাত্রটির উপরস্থ শেষভাগের অন্য একটি দাগ পর্য্যন্ত উঠেছে। ঐ কাচের নলের এই দু'টি দাগের দূরত্ব কতক-গুলো বিশিষ্টভাগে বিভক্ত হ'লেই উত্তাপ মাপ করার একক অথবা ইউনিট্ (unit) পাওয়া যাবে। এই প্রথা অবলম্বন ক'রেই থার্ম্মোমিটার্ প্রস্তুত হয়েছে।

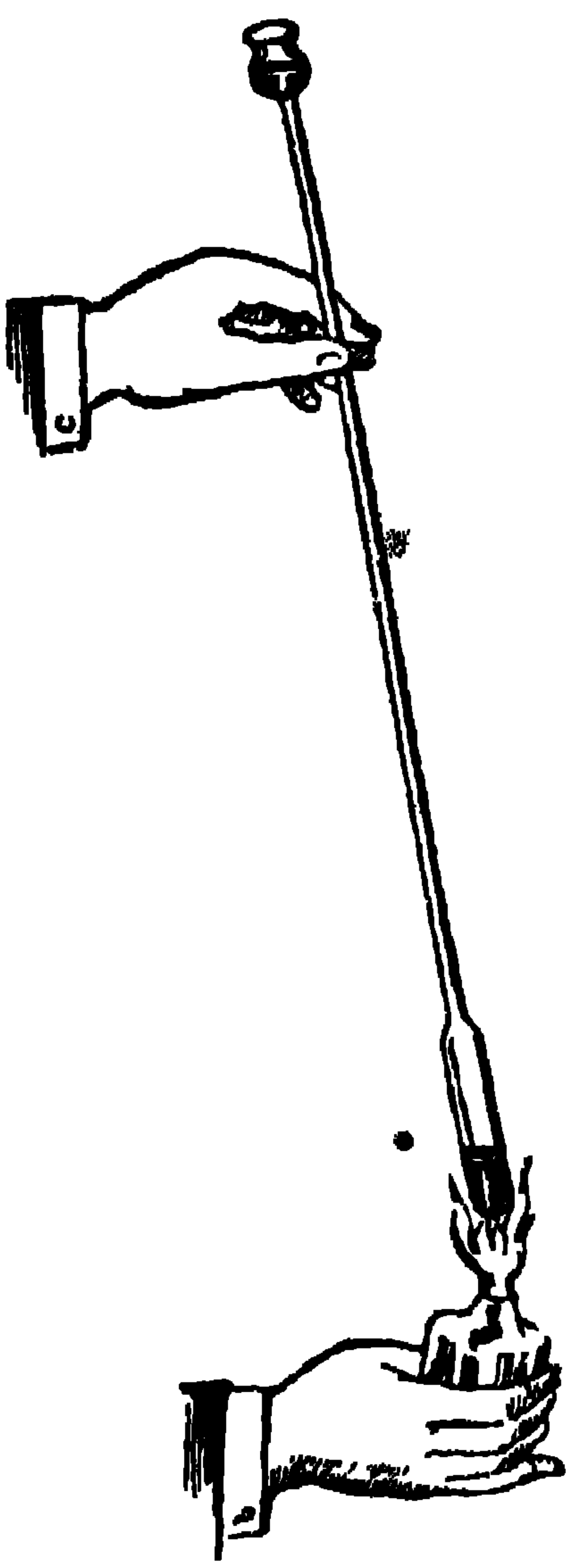

থার্ম্মোমিটার্ প্রস্তুত করা তেমন কঠিন নয়। একটি আগাগোড়া সূক্ষ্ম ছিদ্র-বিশিষ্ট কাচের নল অথবা ক্যাপিলারী টিউব্ (Capillary Tube) নিয়ে প্রথমে তা'র এক প্রান্ত গলিয়ে ফেলে একটি বাল্ব্ (Bulb) প্রস্তুত করা হয়। ঐ টিউব্টির অপর মুখে একটি ফানেল্ (Funnel) সংযুক্ত থাকে। অতঃপর ঐ টিউব্টির মধ্যে কিছু পরিমাণে

পারদ প্রবিষ্ট করাতে হয়, কিন্তু টিউবের ছিদ্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব'লে তা'র মধ্যে পারদ সহজে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। পারদ প্রবিষ্ট করানর সহজ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ঐ ফানেলের মধ্যে কিছু পারদ ঢেলে দিয়ে টিউব্‌টি ছবিতে প্রদর্শিতভাবে একটু বেঁকিয়ে ধ'রে বাল্‌ব্‌টি গরম করা। এই রকম করাতে বাল্‌ব্‌ এবং টিউবের ভিতরকার বাতাস আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফানেলের মধ্য দিয়ে বা'র হ'য়ে যায়। পরে বাল্‌ব্‌টি ঠাণ্ডা কর্‌লে তা'র ভিতরকার বাতাস সংকুচিত হয় এবং তা'র ফলে কিছু পারদ ফানেলের মধ্য দিয়ে টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন টিউব্‌কে সোজা ক'রে ধর্‌লে ঐ পারদ একেবারে বাল্‌বের মধ্যে চ'লে যায়। এইভাবে কয়েকবার গরম এবং ঠাণ্ডা করার চেষ্টা কর্‌লে প্রয়োজনমত পারদ টিউবের মধ্যে চ'লে যাবে। টিউবের মধ্যে এতটা পারদ যাওয়া আবশ্যক যাতে বাল্‌বটি সম্পূর্ণরূপে পারদে ভর্ত্তি হ'য়ে গিয়ে টিউবের কিছু অংশও পারদপূর্ণ হয়।

অতঃপর ঐ বাল্‌বের ভিতরকার পারদকে গরম ক'রে ফুটাতে হবে। তা'হ'লে টিউবের ছিদ্রপথে যত বাতাস আছে সে সমস্তই বা'র হ'য়ে যাবে এবং ছিদ্রপথ পারদ-বাষ্পে পূর্ণ হ'য়ে যাবে। পারদ ফুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই টিউবের খোলা মুখ গলিয়ে ফেলে একেবারে বন্ধ কর্‌তে হবে। এই

রকমে যন্ত্র তৈরী করা হ'লে তা'র ওপর দাগ কাট্‌তে হবে। প্রথমে টিউবটিকে গলমান বরফের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়—এই রকম করাতে ভিতরকার পারদ ছিদ্রপথ বেয়ে ক্রমশঃ নীচে বাল্‌বের দিকে নাম্‌তে থাকে এবং নাম্‌তে নাম্‌তে শেষে এমন স্থানে এসে পৌঁছায় যখন পারদ আর মোটেই নামে না, টিউবের মধ্যে সেই একই স্থানে স্থির ও নিশ্চলভাবে থাকে। এই স্থানটিকে "ক" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর যন্ত্রটি ফুটন্ত গরম জলের উপর ধর্‌লে দেখা যাবে পারদ ক্রমশঃ টিউবের ছিদ্রপথে উপরদিকে উঠ্‌ছে এবং কিছুক্ষণ পরে আর উপরে না উঠে একেবারে স্থির হ'য়ে আছে। এই দ্বিতীয় স্থানটিকে "খ" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এইবার "ক" চিহ্নিত স্থানটিকে ০ এবং "খ" চিহ্নিত স্থানটিকে ১০০ ধ'রে নিয়ে "ক" হ'তে "খ" পর্য্যন্ত দূরত্বটি ১০০ সমান ভাগে বিভক্ত কর্‌লে এই ১০০ ভাগের এক একটি ভাগ এক, এক ডিগ্রী নামে অভিহিত হবে। এই ডিগ্রীই হচ্ছে উত্তাপ মাপার ইউনিট্ (unit) বা একক। এই তাপ-মাপ অথবা থার্ম্মোমিটার্ অনুসারে গলমান বরফের উত্তাপ ০° ডিগ্রী এবং ফুটন্ত জলের তাপ ১০০° ডিগ্রী। এইরকম থার্ম্মোমিটার্ সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটার্ (Centigrade Thermometer) নামে পরিচিত।

সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটার্ ভিন্ন আরও দু'প্রকারের থার্ম্মোমিটার্ আছে। এই দু'প্রকার থার্ম্মোমিটার্ও সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটারের মত একই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। তবে তাদের সাহায্যে মাপ করার পদ্ধতি এবং তাদের ইউনিট্ অথবা একক ভিন্ন রকমের। এই দু'রকম থার্ম্মোমিটারের নাম ফারেন্-হাইট (Fahrenheit) এবং রেমার্ (Reaumur) থার্ম্মোমিটার্। ফারেন্-হাইট্ পদ্ধতি ইংলণ্ডে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত—এইটি একটু অদ্ভুত রকমের। এই পদ্ধতি অনুসারে গলমান বরফের তাপকে ৩২° ডিগ্রী এবং ফুটন্ত জলকে ২১২° ডিগ্রী ধ'রে মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ১৮০ ভাগে বা ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতি অথবা রেমার্ পদ্ধতি অনুসারে গলমান বরফের তাপকে ০° ডিগ্রী এবং ফুটন্ত জলের তাপকে ৮০° ডিগ্রী ধরা হয়। সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটার্—গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগারের যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শরীরের উত্তাপ এবং জ্বর

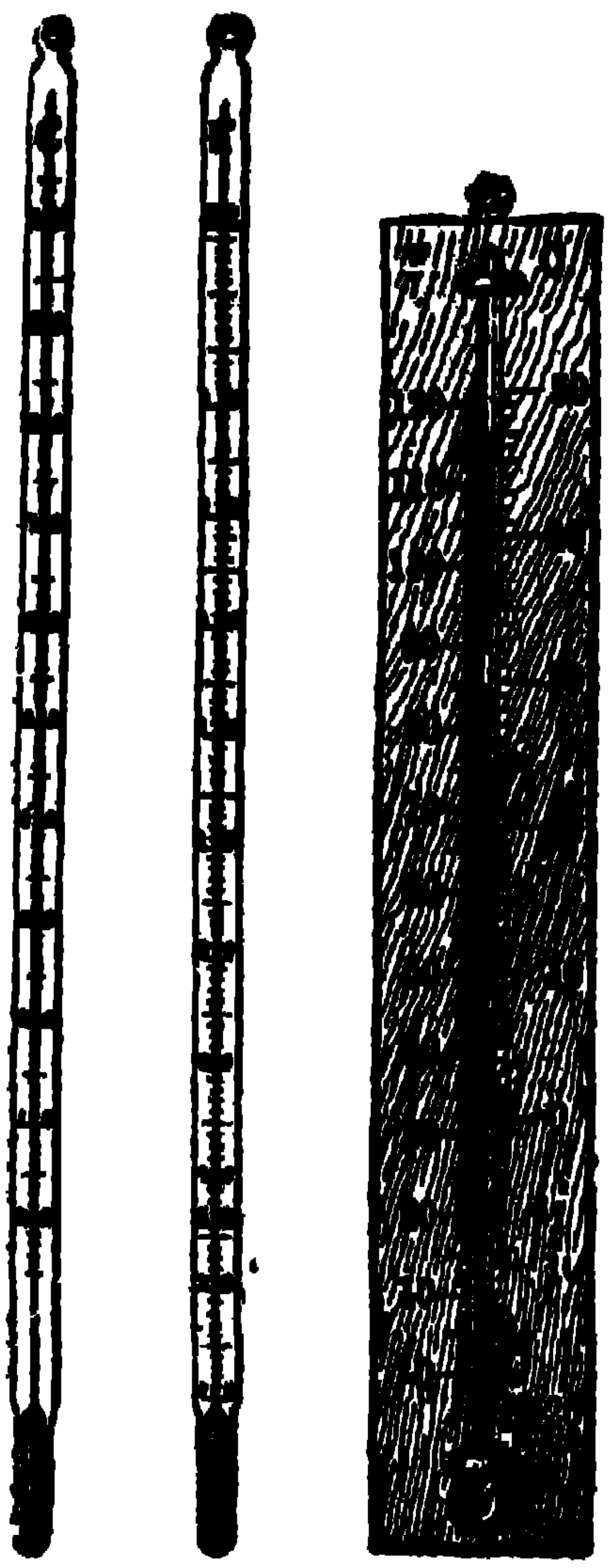

সেন্টিগ্রেড্ ও ফারেন্-হাইট্ মাপের তুলনা

দেখার জন্যে যে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করা হয় সে সকলই ফারেন্-হাইট্।

তোমরা বোধহয় জান, মানুষের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮'৪ ডিগ্রী এবং এই উত্তাপকে নর্ম্যাল্ টেম্পারেচার (Normal Temperature) অথবা স্বাভাবিক তাপ বলা হয়। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জান না, এই ৯৮'৪ ডিগ্রী ফারেন্-হাইট্ পদ্ধতি অনুসারে,—কেননা সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটারের ৯৮'৪ ডিগ্রীতে জল প্রায় ফুট্‌তে থাকে এবং আমাদের দেহের উত্তাপ ফুটন্ত জল অপেক্ষা অনেক কম। তোমাদের বুঝ্‌তে সুবিধা হবে ব'লে সেন্টিগ্রেড্, ফারেন্-হাইট্ এবং রেমার্ এই তিন প্রকার থার্ম্মোমিটারের পদ্ধতি তুলনা ক'রে দিলাম—

পদ্ধতি	জলের হিম-অঙ্ক অথবা বরফের উষ্ণতা	জলের ফুটন-অঙ্ক অথবা ফুটন্ত জলের উষ্ণতা	মধ্যবর্ত্তী স্থান কত ভাগে বিভক্ত হয়েছে
সেন্টিগ্রেড্	০	১০০	১০০
ফারেন্-হাইট্	৩২	২১২	১৮০
রেমার্	০	৮০	৮০

তা' হলে বুঝ্‌তে পার্‌ছ, সেন্টিগ্রেড্ ১° = ১$\frac{৪}{৫}$° ফারেন্-হাইট্ = $\frac{৪}{৫}$° রেমার্।

মনে কর, কোনও পদার্থের উষ্ণতা ৩০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্,

নিলেও শরীরের উত্তাপ কত তা' বুঝতে কিছুই অসুবিধা হয় না। পরে থার্ম্মোমিটারটি অল্প অল্প ক'রে জোরে ঝাড়্লে ঐ অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথটির অপর পাশের পারদও আস্তে আস্তে নেমে বাল্‌বে গিয়ে জমা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ, জ্বর দেখা থার্ম্মোমিটার্ শরীরে বসানর আগে বেশ ক'রে ঝেড়ে নেওয়া হয়।

থার্ম্মোমিটার্ প্রস্তুত করার প্রণালী শুনে মনে হয় থার্ম্মোমিটার্ তৈরী করা এমন কি আর শক্ত! কিন্তু তা' সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্তও আমাদের ভারতবর্ষে কোথাও থার্ম্মোমিটার্ প্রস্তুত হয় না এবং যে সকল থার্ম্মোমিটার্ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' সকলই বিদেশী। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মেণী হ'তেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থার্ম্মোমিটার আমাদের দেশে আসে।

কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী

তোমরা অনেকেই যে মোটরগাড়ী, মোটরবাস্, মোটরলরী প্রভৃতি দেখেছ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ সকল গাড়ী যে একমাত্র "পেট্রোল্" (Petrol) অর্থাৎ একপ্রকার খনিজ তেল দিয়েই চালানো হয়, সে-কথাও তোমাদের সকলেরই খুব সম্ভব জানা আছে। কিন্তু আজকাল একপ্রকার মোটরগাড়ী তৈরী হয়েছে—যেগুলো চালাতে হ'লে পেট্রোলের প্রয়োজন হয় না। প্রথমতঃ ইহাতে একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'লেও বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল অনেক রকম অসম্ভবও সম্ভবপর হচ্ছে। এই নতুন রকমের মোটরগাড়ীও সেই অসম্ভবের মধ্যে একটি। এইপ্রকার মোটরগাড়ী, কোক্ কয়লা অথবা ধূমবিহীন পাথুরে কয়লায় চালানো হয়। কাঠকয়লা বা কয়লার আগুন হ'তে মোটরের এঞ্জিন গরম হয় এবং তা'তেই গাড়ী চলে। কিন্তু যে রকম কয়লাই ব্যবহার করা যাক্ না কেন, সেই কয়লার আগুনে ধোঁয়া হ'লে চল্‌বে না। সেইজন্যে কাঠকয়লা এবং 'কোক্' অথবা একরকম ধূমহীন পাথুরে কয়লাই এই মোটরগাড়ী চালানোর পক্ষে উপযুক্ত।

কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী দেখ্‌তে ঠিক পেট্রোল্-চালিত মোটরগাড়ীরই মত; কিন্তু ভিতরের কল-কজ্বা পেট্রোল্-মোটরের তুলনায় অন্য রকমের। পেট্রোল্-মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীতে পূর্ব্বে একপ্রকার বিশ্রী দুর্গন্ধ বা'র হ'ত, কিন্তু যন্ত্রপাতির অদল-বদল করাতে এখন সেই দুর্গন্ধ আর পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও ইটালীতে আজকাল যে সকল কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে সেগুলো ঠিক পেট্রোল্-মোটরগাড়ীরই মত। এইপ্রকার মোটরগাড়ী ইউরোপের অনেক দেশেই ব্যবহার করা হচ্ছে। একমাত্র জার্ম্মেণীতেই কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী প্রায় দু'হাজার চল্‌ছে। সেই সকল মোটরগাড়ীতে পেট্রোল্-মটরগাড়ীর তুলনায় বিশেষ কোনই অসুবিধা বোধ হয় না।

এইপ্রকার মোটরগাড়ী প্রস্তুত হওয়াতে যে-সকল দেশে পেট্রোল্ একেবারেই পাওয়া যায় না অথবা সামান্যই পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে মোটরগাড়ী চালানো এখন খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। ইউরোপের ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, ইটালী প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশগুলোতে পেট্রোল্ নেই বল্‌লেই হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সকল দেশে মোটরগাড়ী চালানোর উপযোগী যথেষ্ট রকম পেট্রোল্ পাওয়ার জন্য

বিদেশের উপর নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হ'ত। কিন্তু কয়লা-চালিত নতুন মোটরগাড়ীর সৃষ্টি হওয়াতে এখন সেই সকল দেশে অনেক সুবিধা হয়েছে।

পেট্রোল্‌-চালিত মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী চালানোর খরচও অনেক কম। পরীক্ষা ক'রে

কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী

দেখা গিয়েছে যে, এক গ্যালন্‌ পেট্রোলে একটি গাড়ী যত মাইল যেতে পারে, একটি নবাবিষ্কৃত মোটরগাড়ী সাড়ে সাত সের কাঠকয়লাতে তত মাইল পথ যেতে পারে। তা'হ'লে সাড়ে সাত সের কাঠকয়লা এক গ্যালন্‌ পেট্রোলের সমান কাজ করে বলা যেতে পারে। খনি হ'তে তোলা, এক স্থান

হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, দোকানীদের কমিশন প্রভৃতি খরচ দেওয়ার পরে এক গ্যালন্ পেট্রোলের দাম পড়ে অন্ততঃ ছ' আনা ; কিন্তু সাড়ে সাত সের কাঠকয়লা প্রস্তুত ক'রে, এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, কমিশন প্রভৃতি দেওয়ার পরে তা'র দাম হয় বড় জোর তিন আনা। তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, কাঠকয়লা-চালিত নতুন মোটরগাড়ী ব্যবহার কর্‌লে—পেট্রোল্-মোটরগাড়ী চালানোর খরচ হ'তে অর্দ্ধেক খরচে কাজ হ'য়ে যায়। এইজন্যে ইউরোপের অনেক স্থানেই আজকাল পেট্রোল্-চালিত মোটরগাড়ীর পরিবর্ত্তে কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী ব্যবহার করার চেষ্টা চল্‌ছে।

ভারতবর্ষে এখনও কেবলমাত্র পেট্রোল্-মোটরগাড়ীই ব্যবহার করা হচ্ছে ; কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী ব্যবহার করা হয় না। ভারতে পেট্রোল্ কেবলমাত্র আসাম এবং পাঞ্জাব প্রদেশেই পাওয়া যায়, তা'ও আবার অতি সামান্য। ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী চালানোর জন্যে প্রতি বছর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, রুমানিয়া, পারস্য এবং ব্রহ্মদেশ হ'তে আট কোটি গ্যালন্ পেট্রোল্ আমদানী করা হয়। উহার মূল্য বাবদ কোটি কোটি টাকা বিদেশে চ'লে যায়।

পেট্রোল্-চালিত মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীর দাম অনেক বেশী। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে

যে, একটি পেট্রোল্‌-মোটরলরী প্রস্তুত কর্‌তে যত খরচ পড়ে, ঠিক সেই রকম একটি কয়লা-চালিত মোটরলরী তৈরী কর্‌তে প্রায় দু'হাজার টাকা বেশী খরচ লাগে। বিশেষতঃ এখনও মোটরগাড়ী চালানোর উপযোগী কাঠকয়লা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যায় না। কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীর দাম আরও সস্তা হ'লে এবং ঐ গাড়ী চালানোর উপযোগী কাঠকয়লা যথেষ্ট পাওয়া গেলে এদেশেও নতুন ধরণের মোটরগাড়ী চল্‌তে পারে। তা'হ'লে বহু লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'তে পার্‌বে।

ড্রাই-ক্লিনিং

"ড্রাই-ক্লিনিং" (Dry-Cleaning) কথাটি হয়তো তোমরা শুনেছ বা জান। বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যা'রা সহরে বাস কর তা'রা রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে "ডাইং এবং ক্লিনিং"-এর দোকান অর্থাৎ কাপড়চোপড় কাচা এবং রং করার দোকান অনেকই দেখে থাক্‌বে; সেই সকল দোকানের গায়ে লাগান সাইন্‌-বোর্ডের উপর 'ড্রাই-ক্লিনিং' কথাটিও খুব সম্ভবতঃ লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে। এই 'ড্রাই-ক্লিনিং' কথাটির মানে এবং 'ড্রাই-ক্লিনিং' বল্‌তে কি বুঝায় তাই বল্‌ছি।

'ড্রাই-ক্লিনিং' কথাটির মানে শুক্‌না উপায়ে কাপড় কাচা। তোমরা নিশ্চয়ই জান, বিনা জলে জামা, কাপড় পরিষ্কার করা অসম্ভব। সুতরাং ড্রাই-ক্লিনিং অথবা শুক্‌না উপায়ে কাপড়চোপড় পরিষ্কার করার কথা শুনে তোমরা হয়তো আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে, ভাব্‌বে—এ আবার কি ক'রে সম্ভব!

ড্রাই-ক্লিনিং কথাটির মানে শুক্‌না উপায়ে কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা বুঝালেও আসলে কিন্তু এই উপায়টি মোটেই শুক্‌না উপায়ে কাচা নয়। যে সকল প্রণালীতে জামা,

কাপড় বিনা জলে কাচা হয়, সেই সকল প্রণালীকে ড্রাই-ক্লিনিং বলা হয়; তা'তে জলের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু রাসায়নিক তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ যে, ড্রাই-ক্লিনিং মানে শুক্‌না উপায়ে পরিষ্কার করা বুঝালেও এই উপায়টি মোটেই "Dry" অর্থাৎ শুক্‌না নয়।

ড্রাই-ক্লিনিংএর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই প্রণালীতে জামা, কাপড় পরিষ্কার কর্‌তে কোনও রকম সাবান লাগে না। যে সকল রাসায়নিক তরল পদার্থের সাহায্যে ড্রাই-ক্লিনিং করা হয় তা'দের এমনই গুণ যে, তা'রা কাপড়ের তেল অথবা চর্ব্বিজাতীয় দাগ ও সকল রকম ময়লা সহজেই তুলে ফেলে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাষ্পে পরিণত হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং জামা, কাপড় ড্রাই-ক্লিনিং করার সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যায়। এই সকল তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রোল্ (Petrol) এবং বেন্‌জিন্‌ই (Benzene) প্রধান। এই পেট্রোলেই মোটরগাড়ী চলে। ড্রাই-ক্লিনিংএর জন্যে বিশেষরকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে ভাবে ধোবা কাপড় কাচে সেইভাবে ড্রাই-ক্লিনিং হয় না।

তোমরা বোধ হয় জান, পশমী এবং সিল্কের জামা, পোষাক

প্রভৃতি সূতী কাপড়ের মত সাবান এবং জলে কাচা হ'লে সেগুলো আকারে ছোট হ'য়ে যায়। সেইজন্যে পশমী বা সিল্কের পোষাক-পরিচ্ছদ ড্রাই-ক্লিনিং করা হয়। তা'তে জলের কোনও সম্বন্ধ থাকে না এবং পোষাক-পরিচ্ছদও আকারে ছোট হয় না। সাধারণতঃ যে ভাবে কাপড় কাচা হয় তা'র তুলনায় ড্রাই-ক্লিনিংএর খরচা প্রায় পাঁচ-ছ' গুণ বেশী। সুতরাং সূতী কাপড়চোপড় ড্রাই-ক্লিনিং করা অসম্ভব। পশমী বা সিল্কের পোষাক-পরিচ্ছদের দাম সূতী কাপড়চোপড়ের তুলনায় অনেক বেশী; তা' ছাড়া আকারে সমান থাকে ব'লেই কেবলমাত্র পশমী এবং সিল্কের পোষাক-পরিচ্ছদই ড্রাই-ক্লিনিং করা হয়।

ড্রাই-ক্লিনিং বসত-বাড়ীতে করা উচিত নয়, উহা বড় বিপজ্জনক। পেট্রোল্ এবং বেন্‌জিন্ অতি শীঘ্রই বাষ্পে পরিণত হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় এবং সেই বাতাস তখন একটি দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয়। যে ঘরে পেট্রোল্ অথবা বেন্‌জিনের সাহায্যে ড্রাই-ক্লিনিং করা হয় সেই ঘরে বায়ু চলাচলের ভাল রকম ব্যবস্থা না থাক্‌লে সেই ঘরের বাতাস ক্রমশঃ একটা দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয় এবং আগুনের সংস্পর্শ মাত্রই অগ্নিকাণ্ড হয়। সেইজন্যে বাইরে খোলা জায়গাতে ড্রাই-ক্লিনিং করা ভাল। তা' ছাড়া পেট্রোল্ এবং বেন্‌জিনের গ্যাস্ শরীরের পক্ষেও হানিকর।

আমাদের দেশে ড্রাই-ক্লিনিংএর প্রচলন খুব বেশী হয় নি এবং হওয়া সম্ভবপর নয়; কারণ আমাদের দেশ গরম ব'লে আমরা সাধারণতঃ সূতী কাপড়চোপড়ই বেশী ব্যবহার ক'রে থাকি। ইউরোপ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা এবং শীতপ্রধান দেশ। সেখানকার লোকেরাও পশমী পোষাক-পরিচ্ছদই খুব বেশী ব্যবহার করে। এই সকল কারণে ইউরোপে ড্রাই-ক্লিনিং বহুল পরিমাণে প্রচলিত।

পেরিস্‌কোপ্‌

শনিবার—মোহনবাগান ফুটবল গ্রাউণ্ডে ভয়ানক ভীড়—ক্যাল্‌কাটা এবং মোহনবাগানে ফুটবল ম্যাচ্‌ হবে। বেলা দু'টোর সময়ে স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্রই নীতীশ, সমর এবং হীরক, তিনজনে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কোনও মতে বইগুলো যথাস্থানে রেখে, কিছু খেয়েই সোজা একেবারে মোহনবাগান ফুটবল গ্রাউণ্ডের দিকে ছুট্‌ দিল।

নীতীশ বল্‌ল—"দাঁড়াও, একটু দেরী হ'য়ে গেছে—হয়তো টিকিট পাওয়া যাবে না—দেখি, দাদার পেরিস্‌কোপ্‌টি আছে কিনা—"

বাধা দিয়ে হীরক ব'লে উঠ্‌ল—"তোমার যত হাঙ্গামা—আবার পেরিস্‌কোপ্‌ কি হবে? এই ত মোটে তিনটে—খেলা হবে সেই সাড়ে পাঁচটাতে, এখন গেলে আর টিকিট পা'ব না, কি যে বল!"

সায় দিয়ে সমর বল্‌লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যথেষ্ট টিকিট পাওয়া যাবে এখন। ঐ পেরিস্‌কোপ্‌টি এই সারাপথ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যেতে হবে না। শেষে ত আমাকেই বইতে হবে!"

একটু হেসে নীতীশ উত্তর দিল—"কা'কেও বইতে হবে না, আমিই ওটি নিয়ে যা'ব এবং নিয়ে আসব। তবে যদি টিকিট

না পাওয়া যায়, তা'হ'লে কিন্তু আমি একাই ওটি ব্যবহার করব, তখন তোমরা ভাগ বসাতে এস না—তা' আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি।"

"না, না, তোমার বোঝা তুমিই ব'য়ে নিয়ে যাও এবং তুমিই ব্যবহার ক'রো—আমাদের ওতে কোনও প্রয়োজন নেই,"—সমর এবং হীরক ব'লে উঠ্‌ল।

"বেশ, তা'ইই হবে"—ব'লে নীতীশ, বন্ধু দু'জনকে নিয়ে পেরিস্‌কোপ্‌টি হাতে ক'রে রাস্তায় বা'র হ'য়ে পড়্‌ল।

যথাসময়ে ফুটবল গ্রাউণ্ডে পৌঁছে তা'রা দেখ্‌ল টিকিট বিক্রয় করা ত বন্ধ হ'য়ে গেছে, তা'র ওপর মাঠে এত লোক সমাগম হয়েছে যে, যা'কে বলে একেবারে "ন স্থানং তিল ধারণং।" এই রকম অবস্থা দেখে সমর বল্‌ল—"তাই ত! এখন উপায়!"

হীরক বল্‌ল—"দেখ্‌ছি, আরও আগে আসা উচিত ছিল। খেলা আরম্ভ হ'তে এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী, আর এরই মধ্যে এই অবস্থা—কি আশ্চর্য্য!"

তা'দের কথা শুনে একটু হেসে নীতীশ ব'লে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ, আর একটু আগেই আসা উচিত ছিল; কিন্তু তা' যখন আসা হয় নি, তখন 'হাঁ' ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের শোভা দেখ—আমি পেরিস্‌কোপ্‌টির সদ্ব্যবহার করি।"

"তাই ত দেখ্‌ছি, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথাই সত্যি হ'ল—" সমর এবং হীরক উত্তর দিল। তখন তা'রা তিনজন সম্মুখে ভীড় থাকা সত্ত্বেও পিছনে দাঁড়িয়ে নীতীশের পেরিস্‌কোপ্‌টির সাহায্যে ভাগাভাগি ক'রে ফুটবল ম্যাচ্‌ দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

* * * *

তোমরা অনেকেই পেরিস্‌কোপ্‌ জিনিসটি কি তা' জান এবং খুব সম্ভবতঃ পেরিস্‌কোপ্‌ দেখেছ। আবার তোমাদের মধ্যে যা'রা সহরে বাস কর, তা'রা হয়তো নীতীশ, সমর এবং হীরকের মত পেরিস্‌কোপ্‌ যন্ত্রটির সাহায্যে ফুটবল ম্যাচ্‌ দেখে থাক্‌বে। শুধু ফুটবল ম্যাচ্‌ নয়—সম্মুখের বাধা কিংবা ভীড় অতিক্রম ক'রে কোনও কিছু দেখ্‌তে হ'লে পেরিস্‌কোপ্‌ ব্যবহার করা হয়। মনে কর, তোমার সম্মুখে একটি উঁচু পাঁচীল আছে—তা'র ওপারে কি আছে তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না। এই রকম অবস্থায় হয় একটি "মই" অথবা গাছের ওপর ওঠা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। কিন্তু যদি তোমার একটি পেরিস্‌কোপ্‌ থাকে, তা'হ'লে তুমি তা'র সাহায্যে অনায়াসেই পাঁচীলের ওপারে কি আছে দেখ্‌তে পাবে।

পেরিস্‌কোপ্‌ যন্ত্রটির আবিষ্কার এবং সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার হয় সামরিক বিভাগে। গত ইউরোপীয় মহাসমরে বহু পেরিস্‌-কোপ্‌ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই যন্ত্রটি অতি সহজেই

প্রস্তুত করা যায় এবং তোমরা আপন আপন বাড়ীতেও পেরিস্‌কোপ্‌ তৈরী ক'রে নিতে পার। কি উপায়ে পেরিস্‌কোপ্‌ তৈরী করা যায় সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি।

পেরিস্‌কোপ্‌ যন্ত্রটি প্রস্তুত করার মূলে একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য আছে; সেটি হচ্ছে, একটি আলোকরশ্মি

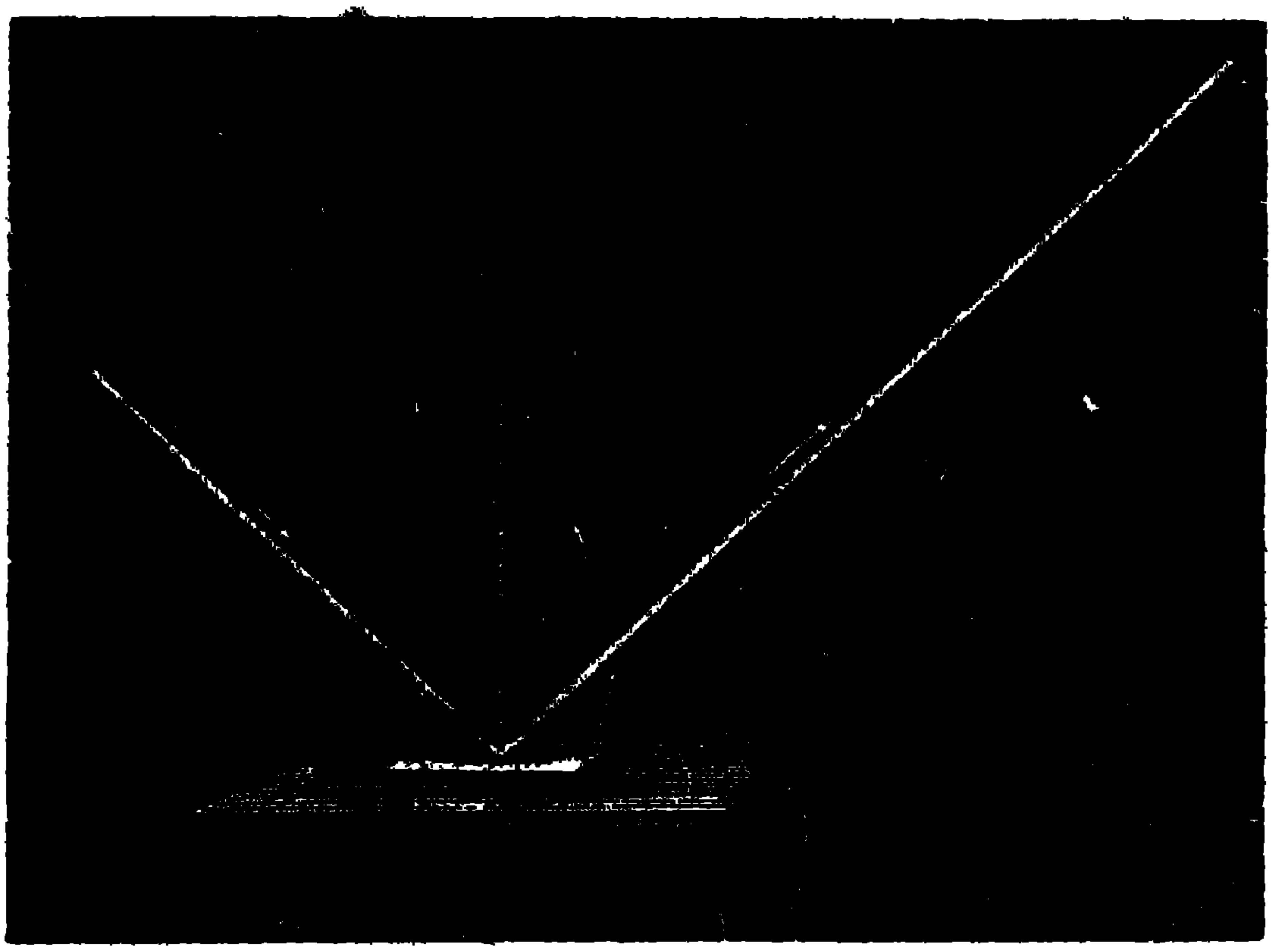

কোনও একটি দর্পণ অথবা আয়নার ওপর পড়্‌লে যে অ্যাঙ্গল্‌ (angle) অথবা কোণ রচনা করে, ঐ দর্পণ হ'তে প্রতিফলিত রশ্মিও ঠিক সমান কোণ রচনা ক'রে ভিন্ন দিকে চ'লে যায়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রেছ, কোনও দর্পণের ওপর আলোকরশ্মি পড়্‌লে সেই রশ্মি প্রতিফলিত হয় এবং একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারাই তা' প্রমাণ করা যায়। ঐ আলোকরশ্মি

দর্পণের ওপর পড়া মাত্রই যে কোণ সৃষ্টি হয়, প্রতিফলিত রশ্মিও দর্পণের সঙ্গে সমান কোণ রচনা ক'রে অন্যদিকে চ'লে যায়।

আলোকরশ্মির আরও একটি মজা এই যে, প্রতিফলিত

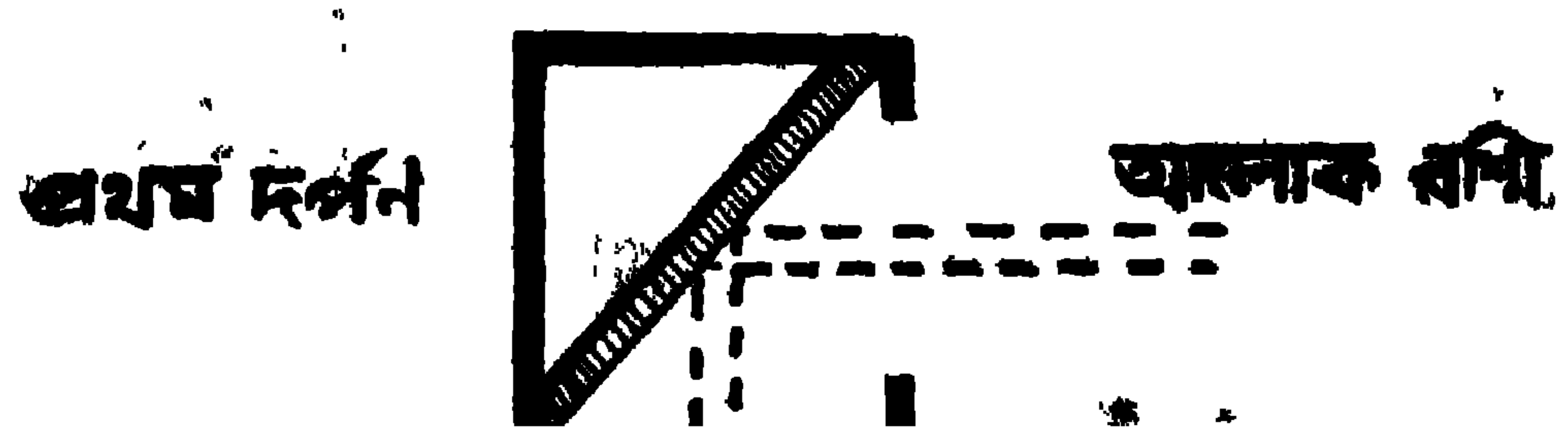

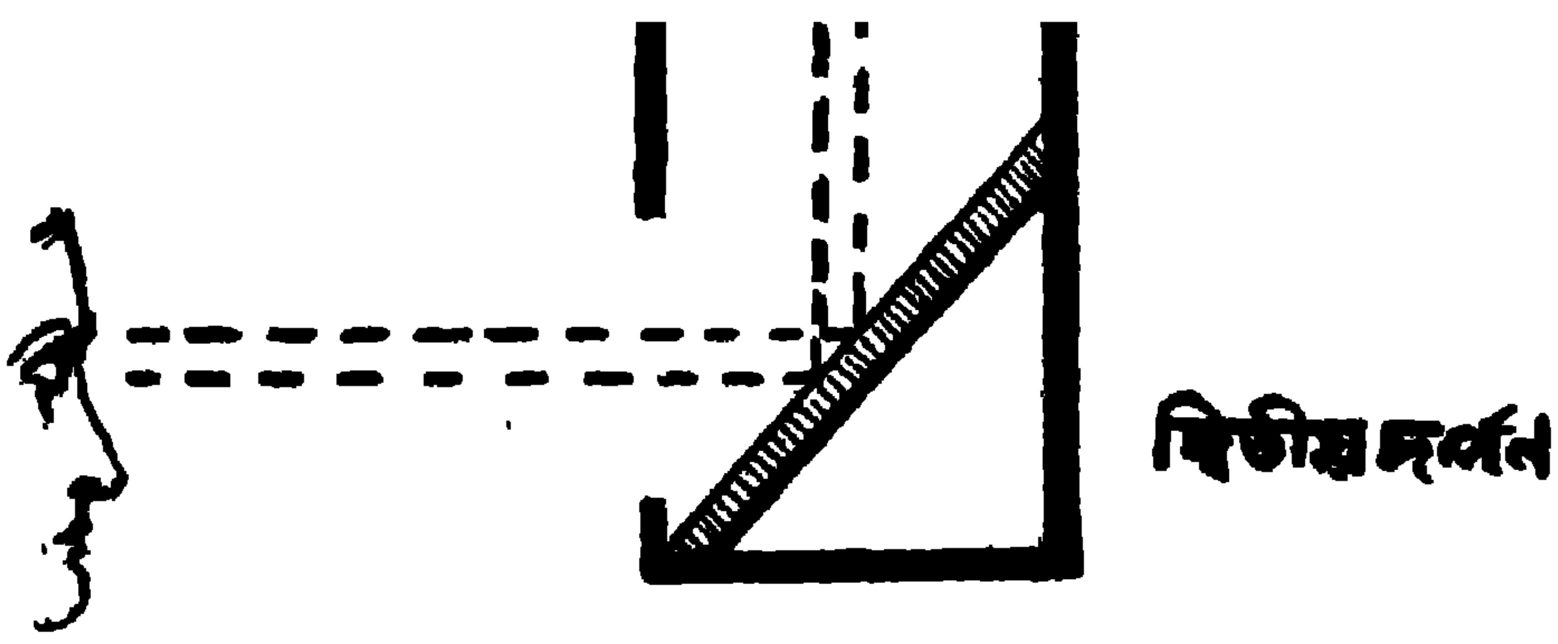

রশ্মিকে ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় একটি দর্পণে পুনঃ প্রতিফলিত করা যায়। এই তথ্যটিই পেরিস্কোপ্ যন্ত্র প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

পেরিস্‌কোপ্‌ যন্ত্রটি দু'টি দর্পণের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। এই দর্পণ দু'টি সমান্তরালভাবে অবস্থিত থাকে এবং দু'টি দর্পণই ছবিতে প্রদর্শিতভাবে ভূমিতলের সঙ্গে ৪৫° ডিগ্রী ক'রে রাখা হয়। উপরের দর্পণে দূরের চিত্র কিংবা দৃশ্য প্রতিফলিত হ'য়ে পরে পুনরায় নীচের দর্পণে আপতিত হয় এবং নীচের দর্পণ হ'তে প্রতিফলিত হ'য়ে দর্শকের চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করে।

পেরিস্‌কোপ্‌ যন্ত্র কি উপায়ে প্রস্তুত করা যায় তা' বোধ হয় তোমরা এখন বুঝ্‌তে পেরেছ। তোমরাও নিজেরা পেরিস্‌-কোপ্‌ প্রস্তুত ক'রে নিতে পার।

পেরিস্‌কোপ্‌ ব্যবহার করার সময়ে একটি নিয়ম সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে। যদি সম্মুখের পাঁচীল অথবা এই প্রকার কোনও বাধা বা ভীড়ে পেরিস্‌কোপের উপরকার দর্পণটি একেবারে ঢেকে ফেলে, তা'হ'লে পেরিস্‌কোপ্‌ অচল হ'য়ে যায়। কারণ উপরকার দর্পণে কোনও আলোকরশ্মি আপতিত না হ'লে নীচেকার দর্পণে কোনও আলোকরশ্মিই প্রতিফলিত হবে না এবং এরূপ অবস্থায় দর্শকের চক্ষুতেও কিছুই দ্রষ্টব্য বস্তু প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং পেরিস্‌কোপ্‌ ব্যবহার করার সময়ে সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে, সম্মুখস্থ পাঁচীল অথবা ভীড়ে উপরকার দর্পণটি যেন সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না হয়।

কেসিন্

"কেসিন্" কথাটি তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইতিপূর্ব্বে শোন নি। কিন্তু কেসিনের তৈরী কোনও না কোনও জিনিস খুব সম্ভব তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখেছ। এই "কেসিন্" জিনিসটি কি এবং কি ভাবে প্রস্তুত হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'-চার কথা বল্‌ছি।

কেসিন্ এক রকম শক্ত এবং খুব চক্‌চকে জিনিস। ইহা একটি রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। কেসিন্ কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় তা' শুন্‌লে তোমরা হয়তো অবাক্ হ'য়ে যাবে। কেসিন্ তৈরী করা হয় দুধ থেকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেসিনে দুধের এতটুকুও গন্ধ পাওয়া যায় না। দুধের মত তরল পদার্থ থেকে একটা শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী জিনিস প্রস্তুত করা যায় এবং তা' দেখ্‌তে মোটেই দুধের মত নয়, কিংবা তা'তে দুধের কোনও গন্ধও নেই—এই রকম কথা শুন্‌তে প্রথমতঃ কি রকম লাগে; কিন্তু হয়তো তোমাদের চোখের সাম্‌নে টেবিলের ওপরেই একটি সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্র আছে যা' কেসিন্ থেকে তৈরী করা হয়েছে!

কেসিন্

মাঠা তোলা দুধ অর্থাৎ দুধ থেকে মাখন তুলে নেওয়ার পরে সেই দুধের দই তৈরী করা হয়। সেই দই থেকে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক রকম শক্ত জিনিস পাওয়া যায়। এই শক্ত জিনিসটিকে একটি ট্রে বা থালাজাতীয় পাত্রের ওপর রেখে, কিছুক্ষণ ধ'রে গরম করার পরে যে জিনিসটি পাওয়া যায় তা'র নাম কেসিন্ (Casein)। কেসিন্‌কে গুঁড়ো ক'রে নানারকম রঙের সাহায্যে ইচ্ছামত রং করা যায়।

কেসিন্ থেকে যেরকম আকারের প্রয়োজন, ঠিক সেই রকম আকারেরই জিনিসপত্র তৈরী করা যায়। ধাতুনির্ম্মিত নানাপ্রকারের ছাঁচের মধ্যে কেসিনের গুঁড়ো ভর্ত্তি ক'রে, তা'তে ইচ্ছামত রং মিশিয়ে সেই ছাঁচগুলো খুব গরম করা হয় এবং পরে একটি যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত চাপ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ এইভাবে চাপ দেওয়ার পরে, চাপ দেওয়া যন্ত্র বন্ধ করা হয় এবং ছাঁচগুলো ঠাণ্ডা হ'লে খুলে ফেলে কেসিনের জিনিসগুলো বা'র করা হয়। তখন এই সকল কেসিনের জিনিসপত্র খুব শক্ত এবং উজ্জ্বল হয়। কেসিনে তৈরী জিনিসপত্র স্বভাবতঃ খুবই চক্‌চকে হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার কর্‌লেও তা'দের ওপরকার পালিশ নষ্ট হয় না।

দুধ থেকে কেসিন্ কি ক'রে প্রথমে তৈরী করা হয় সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন কোনও একজন রাসায়নিকের

একটি বেড়াল, তিনি যে ঘরে গবেষণা কর্‌তেন সেই ঘরে হঠাৎ ঢুকে প'ড়েছিল। সেই ঘরে নানারকম রাসায়নিক জিনিস ছিল এবং তা'দের মধ্যে একটি কাচের পাত্রে ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্‌ (Formaldehyde) নামক একটি তরল রাসায়নিক পদার্থ ছিল। বেড়ালটি পাছে কিছু নষ্ট করে এই ভয়ে তা'কে তাড়া দিতেই সে পালিয়ে গেল, কিন্তু তা'র পায়ের ধাক্কা লেগে খানিকটা ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্‌ ছিট্‌কিয়ে নিকটে একটি পনীরের পাত্রে পড়্‌ল। সেই পাত্রে তখন খানিকটা পনীর ছিল। ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্‌ পনীরের ওপর পড়ার কিছুক্ষণ পরে সেই পনীর একেবারে শক্ত হ'য়ে গেল! তা'ই দেখে সেই রাসায়নিক ঐ পনীর নিয়ে গবেষণা আরম্ভ কর্‌লেন এবং তাঁ'র গবেষণা এবং চেষ্টার ফলে দুধ থেকে কেসিন্‌ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করা হ'ল। তোমরা নিশ্চয়ই জান পনীর দুধ থেকেই তৈরী হয়। এই আবিষ্কারের মূলে কিন্তু ঐ বেড়ালটি! যদি বেড়ালটি ঐ ঘরে না ঢুক্‌ত তা'হ'লে কেসিন্‌ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভবপর হ'ত না। এই সামান্য একটি কারণে একটি নূতন জিনিস প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত হ'ল!

ধাতুনির্ম্মিত জিনিসের তুলনায় কেসিন্‌ থেকে প্রস্তুত জিনিসপত্র দামে অনেক সস্তা। তা'ছাড়া কেসিনে তৈরী জিনিসপত্র অতি সহজে এবং যে কোনও আকারে প্রস্তুত করা

যায়। এই জিনিসগুলো ধাতুনির্ম্মিত জিনিসের তুলনায় দেখ্‌তে অনেক সুন্দর। এই সকল কারণে আজকাল কেসিন্ থেকে ছাতার হাতল, ফাউন্টেন পেন, কাগজচাপা-দেওয়া ইত্যাদি নানারকমের জিনিস তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু দুধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না গেলে কেসিন্ তৈরী করা সম্ভবপর হয় না, সেইজন্যে আমাদের ভারতবর্ষে খুব সহজে কেসিনের জিনিসপত্র তৈরী করা একরকম অসম্ভব। কারণ, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে খুব কম লোকই নিয়মিতভাবে দুধ খেতে পায় এবং উপস্থিত যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় তা' সকলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি ভবিষ্যতে এই দেশে কখনও বহু পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় এবং সকলে নিয়মিতভাবে খাওয়ার পরেও অতিরিক্ত দুধ প'ড়ে থাকে, তা'হ'লে তখন এই দেশে কেসিন্ তৈরী করা সম্ভবপর হবে এবং সেই কেসিন্ থেকে নানাপ্রকার জিনিসও প্রস্তুত করা যাবে।

ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌

তোমরা খুব সম্ভব ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ দেখেছ এবং উহা কি জিনিস তা'ও বোধ হয় জান। তোমাদের মধ্যে যা'দের বাড়ী সহরে, তা'দের অনেকের বাড়ীতেই হয়তো ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ রয়েছে—আবার যা'রা পল্লীগ্রামে বাস কর এবং ইলেক্‌ট্রীক্‌ হাত-বাতি বা টর্চ্চ ব্যবহার ক'রে থাক, তা'রা টর্চ্চে আটকান ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ দেখে থাক্‌বে। এই ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ কি ভাবে তৈরী করা হয় সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

ইলেক্‌ট্রীকের সাহায্যে আলো জ্বালান যায় কিনা এ সম্বন্ধে স্যার্‌ হাম্‌ফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষা করেন। তিনি একটি শক্তিশালী ব্যাটারী তৈরী করেন। ব্যাটারী কি জিনিস তা' বোধ হয় তোমরা জান। এই ব্যাটারী থেকেই ইলেক্‌ট্রীসিটি (Electricity) বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেই বিদ্যুৎ নানা কাজে লাগান হয়। প্রত্যেক ব্যাটারীর দু'টি মুখ থাকে। এই দু'টি মুখের নাম টার্‌মিন্যাল্‌ (Terminal)। হাম্‌ফ্রে যে ব্যাটারী তৈরী কর্‌লেন তা'র দু'টি টার্‌মিন্যাল্‌ থেকে দু'টি তামার তার লাগিয়ে দিলেন এবং যখন এই তার দু'টির মুখ পরস্পরের খুব কাছাকাছি আনা হ'ল তখন একটি বড় স্পার্ক (spark) বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'ল।

তা'র পর হাম্‌ফ্রে কার্‌বন্ (carbon) নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের দু'টি সরু এবং ছোট লাঠি তৈরী কর্‌লেন—এই ছোট লাঠি দু'টি ঠিক সিগারেটের মত আকারের ছিল এবং প্রত্যেক লাঠির মুখ দু'টি খুব সরু করা হ'ল। কার্‌বন্ দেখ্‌তে কয়লার মত কালো এবং কয়লারই স্বজাতি। এই রকম দু'টি কার্‌বনের লাঠি তৈরী ক'রে তা'দের দুই মুখ ঐ ব্যাটারীর দু'টি টার্‌মিন্যালের সঙ্গে তামার তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হ'ল। তারপর লাঠি দু'টির অন্য দু'টি মুখ পরস্পরের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে একটু তফাৎ ক'রে দেওয়া হ'ল এবং এই রকম করার ফলে উজ্জ্বল আলোর শিখা পাওয়া গেল। কার্‌বন্ কয়লার মত শক্ত পদার্থ; কিন্তু কার্‌বনের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রীসিটি চ'লে গেলে কার্‌বন্ ক্রমশঃ গরম হয় এবং বাষ্পে পরিণত হয়। কার্‌বনের এই বাষ্পই লাঠি দু'টির মধ্যেকার ফাঁক পূর্ণ ক'রে তা'দের সংযোগ ক'রে দেয় এবং তা'র ফলে উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করে। হাম্‌ফ্রের আবিষ্কৃত এই উপায়ে খুব শক্তিশালী ইলেকট্রীক্ আলো তৈরী করা হয়; এই রকম আলোর নাম আর্ক ল্যাম্প (Arc Lamp)। রাস্তায় আলো দেওয়ার কাজে এবং ষ্টীমারের সার্চ্চ লাইট্ ও বায়স্কোপের মেসিনে এখনও আর্ক ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়।

হাম্‌ফ্রে আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার কর্‌লেন বটে, কিন্তু উহা

বাড়ীতে আলো দেওয়ার কাজে ব্যবহার করার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। আজকাল বাড়ীতে যে সকল ইলেক্‌ট্রীক্‌ আলো জ্বলে তা' সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। হাম্‌ফ্রের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে দেখ্‌লেন যে, যদি কোনও খুব সরু তারের মধ্য দিয়ে ইলেক্‌ট্রীসিটি চ'লে যায় তা'হ'লে সেই তার গরম হয়। এই রকম হওয়ার কারণ এই যে, অত্যন্ত

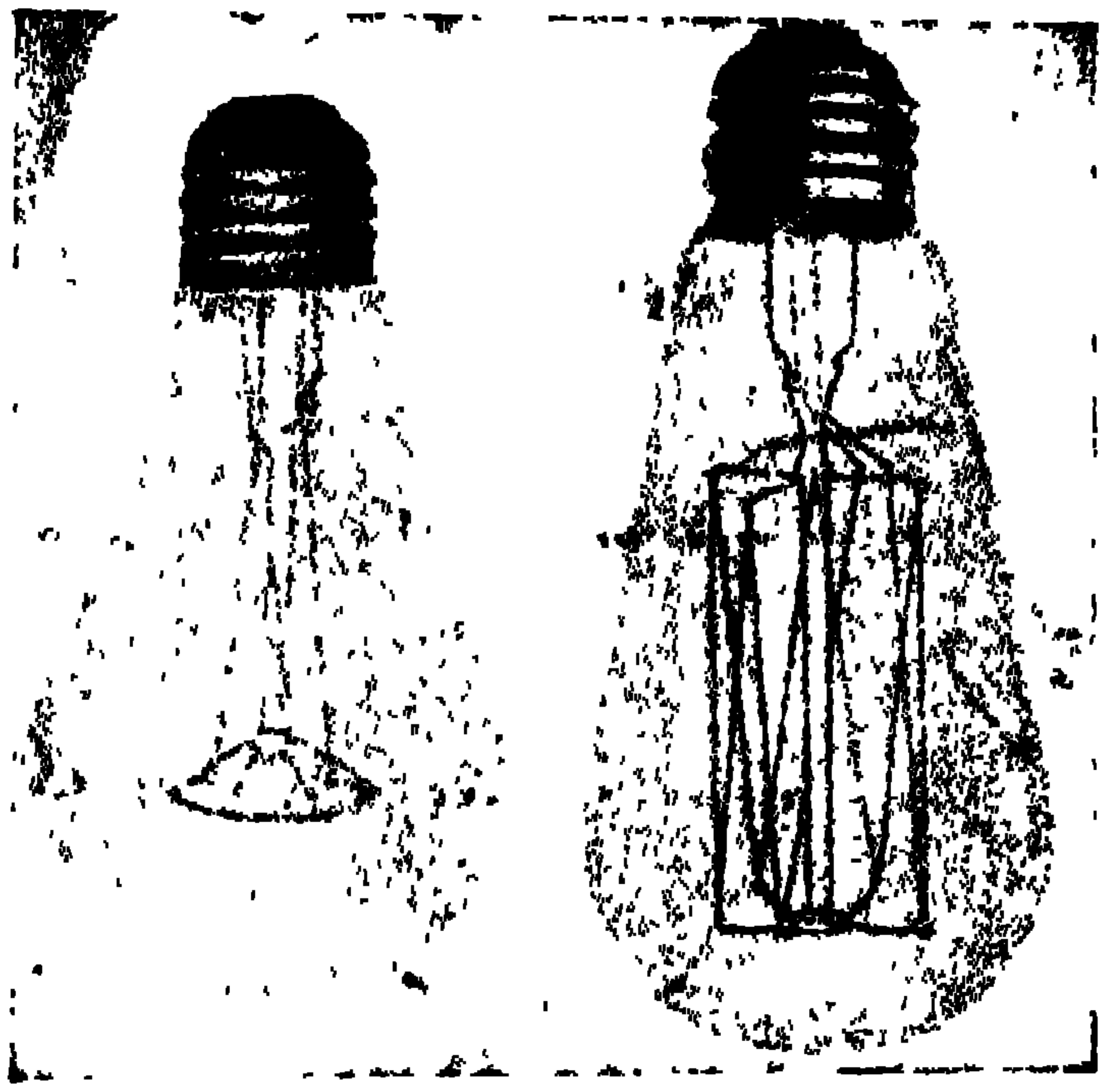

ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌

সরু তারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বাধা পায় এবং তারের অণু-পরমাণুগুলোর মধ্যে কাঁপুনী সৃষ্টি করে এবং তা'র ফলে ওই তার ক্রমশঃ গরম হয়। আবার তার যত সরু বা সূক্ষ্ম হবে তত বেশী গরম হবে। লোহা বা ইস্পাতের তার খুব শীঘ্র গরম হয় এবং পরে জ্বল্‌তে থাকে—শেষে ক্রমশঃ

গ'লে একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। বৈজ্ঞানিকগণ আরও পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন যে, লোহা বা ইস্পাতের পরিবর্ত্তে প্ল্যাটিনাম্ (Platinum) নামক মহামূল্যবান্ ধাতু-নির্ম্মিত তার ব্যবহার কর্‌লে সেই তার খুব ভাল রকম জ্বল্‌তে থাকে এবং তা'র ফলে আলো হয়।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্‌ই (Edison) সর্ব্বপ্রথম ইলেক্‌ট্রীক্ বাতি আবিষ্কার করেন। তিনি একটি কাচের বাল্‌ব্ (bulb) তৈরী ক'রে তা'র মধ্যে প্ল্যাটিনাম্-নির্ম্মিত

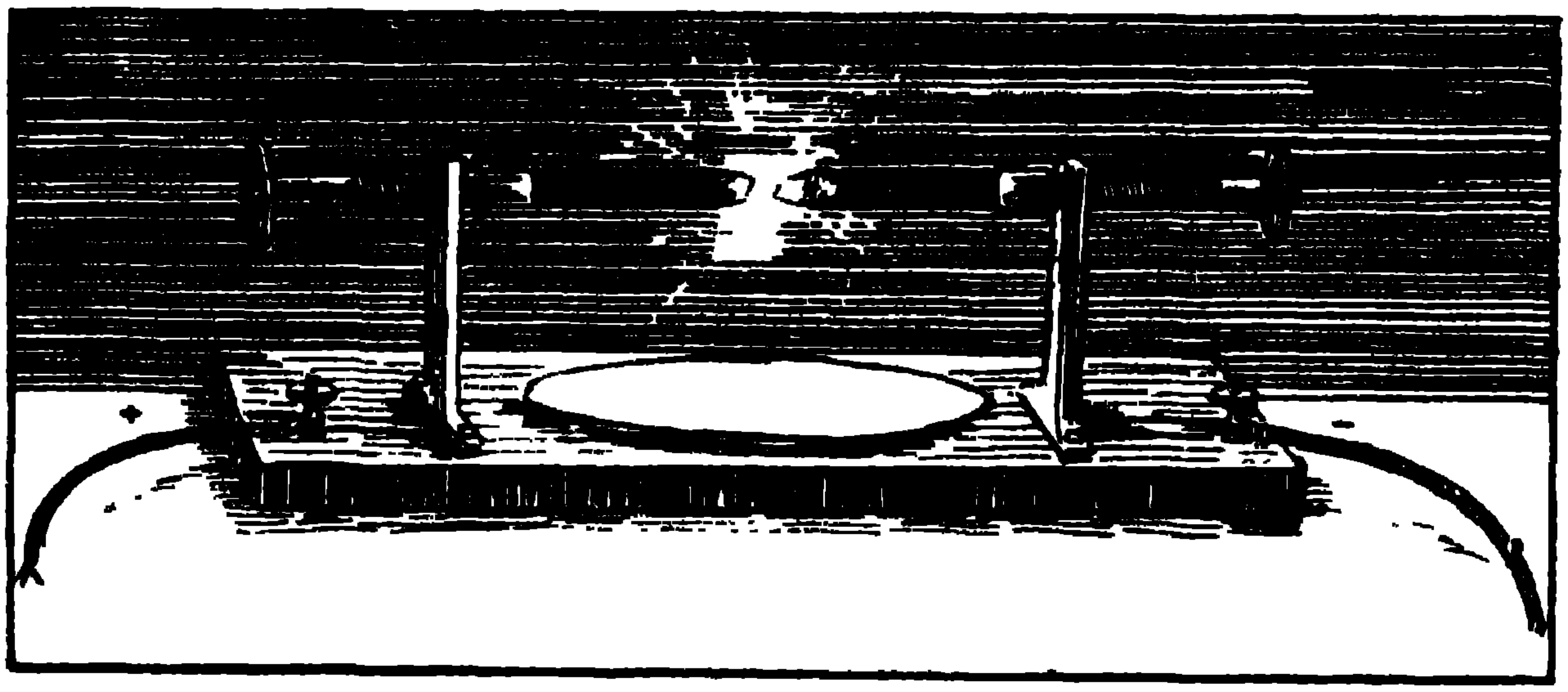

আর্ক ল্যাম্প

তারের একটি কুণ্ডলী রেখেছিলেন। এই তারের কুণ্ডলীর দুই মুখ একটি সরু কাচের নলের মধ্য দিয়ে ঐ বাল্‌বের মাথা পর্য্যন্ত আটকান ছিল। প্ল্যাটিনাম্-নির্ম্মিত তার ব্যবহার করার প্রধান কারণ এই যে, প্ল্যাটিনামের তারের মধ্য দিয়ে ইলেক্‌ট্রীসিটি চ'লে গেলে অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত তারের তুলনায়

সেই তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জ্বল্‌তে থাকে এবং আলো হয়। আরও কারণ হচ্ছে যে, প্ল্যাটিনাম্ অনেক বেশী উত্তাপেও গ'লে যায় না। আর একটা কারণ—প্ল্যাটিনাম্ ধাতুটি এমন যে, তা' থেকে অতি সরু এবং সূক্ষ্ম তার তৈরী করা যায়। ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌বের জন্যে অতি সরু তারই আবশ্যক, কারণ তা' না হ'লে মোটা তার জ্বালাতে অনেক বেশী ইলেক্‌ট্রীসিটির প্রয়োজন হবে : এসব কারণে অত্যন্ত মূল্যবান্ হ'লেও আগে প্ল্যাটিনাম্‌ই ব্যবহার করা হ'ত।

এইভাবে প্ল্যাটিনামের সরু তারের সাহায্যে ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌বের সৃষ্টি হ'ল। বাল্‌ব তৈরী কর্‌তে যে সরু তারের কুণ্ডলী ব্যবহার করা হয় তা'র নাম ফিলামেণ্ট (Filament)। কিছুদিন পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, প্ল্যাটিনামের ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে ইলেক্‌ট্রীসিটি গেলে ফিলামেণ্ট জ্বল্‌তে থাকে। তা'তে আলো হয় বটে, কিন্তু বাল্‌বের ভিতরকার ঠাণ্ডা বাতাসে ফিলামেণ্টের উত্তাপ ক'মে যায় এবং এই রকমে ফিলামেণ্ট ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে আলোর তেজও ক্রমশঃ ক'মে আসে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে বাল্‌বের ভিতরকার বাতাস পাম্পের সাহায্যে বা'র ক'রে বাল্‌বের মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল এবং এতে আলো ক'মে যাওয়ার সম্ভাবনা থাক্‌ল না।

প্ল্যাটিনামের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও একটি অসুবিধা ছিল।

সেইটি হচ্ছে এই যে, প্ল্যাটিনাম্ অনেক বেশী ডিগ্রী উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পার্‌লেও যদি ভুলক্রমে অসাবধানতাবশতঃ একটু বেশী শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রীসিটি প্ল্যাটিনামের তারের মধ্য দিয়ে যায়, তা'হ'লেই ফিলামেণ্ট একেবারে গ'লে যায় এবং তখন সেই বাল্ব্ও অকেজো হ'য়ে যায়। এইজন্য এডিসন্ অন্য কোনও ধাতু, যা' প্ল্যাটিনাম্ থেকেও বেশী উত্তাপ

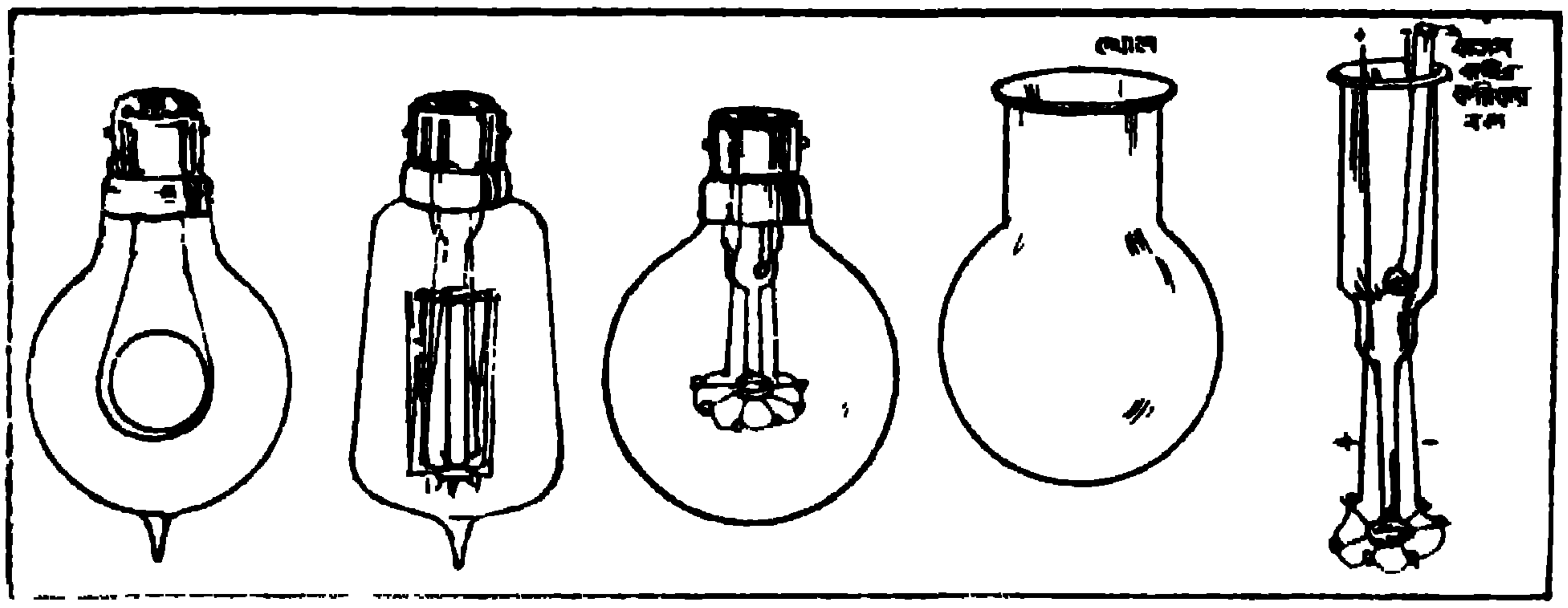

রকমারী বাল্ব্ ও বাল্‌বের অংশ

এবং ইলেক্‌ট্রীসিটি সহ্য কর্‌তে পারে, তা'ই নিয়ে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি প্রথমে কার্‌বনের কথা ভাব্‌লেন, কারণ কার্‌বন্ তখন আর্ক ল্যাম্পে ভালভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছিল। অনেক চেষ্টা ক'রে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্‌বনের ফিলামেণ্ট তৈরী করার উপায় উদ্ভাবন কর্‌লেন। তিনি বাঁশ থেকে খুব সরু এবং লম্বা সূতা তৈরী ক'রে সেগুলোকে বেঁকিয়ে এবং পাক খাইয়ে, প্ল্যাটিনাম্ ফিলামেণ্টের আকার দিলেন ;

পরে সেগুলোকে খুব বেশী ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করলেন। তা'তে সেগুলো পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়ে কার্‌বনের ফিলামেণ্ট প'ড়ে থাক্‌ত। তোমরা বোধ হয় জান না যে, বাঁশের মধ্যে কার্‌বন্ আছে এবং বাঁশ পুড়ে ছাই হ'লে উহা কার্‌বনে পরিণত হয়। এইভাবে কার্‌বনের ফিলামেণ্ট তৈরী করা এক শক্ত ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এডিসন্ শেষ পর্য্যন্ত কার্‌বনের ফিলামেণ্ট তৈরী ক'রে কাচের বাল্‌বের মধ্যে রাখ্‌লেন এবং ফিলামেণ্টের দুই মুখ দু'টি সরু প্ল্যাটিনামের তারের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেন। এই প্ল্যাটিনামের তার দু'টি একটি সরু কাচের নলের মধ্য দিয়ে একেবারে বাল্‌বের মাথায় চ'লে যেত। এইভাবে বাল্‌ব্ ও ফিলামেণ্ট তৈরী ক'রে পাম্পের সাহায্যে বাল্‌বের ভিতরকার বাতাস বা'র ক'রে দেওয়া হ'ত, কারণ তা' না হ'লে বাতাসের মধ্যেকার অক্সিজেন্ গ্যাস্ জ্বলন্ত কার্‌বনের ফিলামেণ্টের সংস্পর্শে আসামাত্রেই কার্‌বন্ ডাই-অক্‌সাইড (Carbon dioxide) নামক একরকম গ্যাস্ উৎপন্ন হয় এবং তা'র ফলে ক্রমশঃ কার্‌বনের ফিলামেণ্ট নষ্ট হ'য়ে যেত। তা' ছাড়া বাল্‌বের ভিতরকার বাতাস পাম্প ক'রে বা'র না ক'রে দিলে সেই ঠাণ্ডা বাতাসে ফিলামেণ্ট ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত এবং আলোর তেজও ক'মে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এইভাবে প্রস্তুত কার্‌বন্-ফিলামেণ্টের ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্

বহুদিন পর্য্যন্ত আলো জ্বালানের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু এই বাল্‌বেরও একটি দোষ ছিল। কার্‌বনের খুব সূক্ষ্ম ফিলামেণ্ট ব্যবহার কর্‌লেও যে আলো পাওয়া যেত তা' খুব উজ্জ্বল নয় এবং কার্‌বন্ ১৩০০ ডিগ্রী উত্তাপে গ'লে যায় ব'লে খুব শক্তিশালী ইলেকট্রীসিটি ব্যবহার করা যেত না। সেইজন্যে কার্‌বন্ থেকেও বেশী উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পারে এমন কোনও জিনিস আছে কিনা সেই বিষয়ে গবেষণা চল্‌তে লাগ্‌ল।

ঠিক এই সময়ে ওয়েল্‌স্ ব্যাক্ (Wels Back) নামক একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক, গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টল্ (mantle) বা বাতি সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্‌ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্‌মিয়াম্ (Osmium) নামক একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু-নির্ম্মিত ফিলামেণ্ট-যুক্ত বাল্‌ব্ তৈরী কর্‌লেন। এই অস্‌মিয়াম ধাতু ২২০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পারে এবং এইটি এত মূল্যবান্ ধাতু ছিল যে, ওয়েল্‌স্ ব্যাক্ যখন এই ধাতু থেকে ফিলামেণ্ট তৈরী করেন তখন তা'র মাত্র আধ সের ওজনের দাম ছিল ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ টাকা! এই নতুন ধাতু-নির্ম্মিত ফিলামেণ্টে কার্‌বন্ ফিলামেণ্ট অপেক্ষা অনেক ভাল আলো হ'ল এবং এই ফিলামেণ্ট ব্যবহার করাতে অপেক্ষাকৃত কম ইলেকট্রীসিটি খরচ হ'ত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মেণীতে একরকম নতুন ফিলামেণ্ট আবিষ্কার করা হ'ল। এই ফিলামেণ্ট ট্যাণ্টালাম্ (Tantalum) নামক ধাতু-নির্ম্মিত ছিল। এই ধাতুটি প্রায় ৩০০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পারে। তা' ছাড়া এই ধাতু থেকে খুব সরু তার তৈরী করা যেত। কিন্তু এই তারের ফিলামেণ্টে যথেষ্ট রকম আলো পেতে হ'লে কার্‌বন্ ফিলামেণ্ট অপেক্ষা অনেক বড় ফিলামেণ্ট প্রয়োজন হ'ত এবং অত বড় তার ছোট কাচের বাল্‌বের মধ্যে যাবে না ব'লে, ফিলামেণ্টটিকে পাক খাইয়ে মাকড়সার জালের আকারে বাল্‌বের মধ্যে রাখা হ'ত। এখন পর্য্যন্তও এইভাবেই ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌বের ফিলামেণ্ট তৈরী করা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে কিছুদিন পর্য্যন্ত এই রকম ট্যাণ্টালাম্‌ধাতু-নির্ম্মিত ফিলামেণ্টযুক্ত ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

অতঃপর টাঙ্গ্‌ষ্টেন্ (Tungsten) নামক আর একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ল। এই ধাতু ৩০০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ অবস্থাতে এই ধাতু কাচের মত খুবই ক্ষণভঙ্গুর এবং তা' থেকে সূক্ষ্ম তার তৈরী করা যায় না। কি ক'রে এই অসুবিধা দূর করা যায় তা'ই নিয়ে রাসায়নিকগণ পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে আমেরিকাতে একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে বা'র

কর্‌লেন—যদি টাঙ্গ্‌ষ্টেন্‌ধাতুকে খুব বেশী উত্তাপ দিয়ে একেবারে টক্‌টকে লাল এবং শেষে শাদা অবস্থায় আনা যায় তবে সে অবস্থায় তা'কে পিটিয়ে তা' থেকে ফিলামেণ্টের উপযোগী সরু তার তৈরী করা যায়। এই পরীক্ষার পরে টাঙ্গ্‌ষ্টেন্ থেকে ফিলামেণ্ট তৈরী করা হ'তে লাগ্‌ল। আজকাল টাঙ্গ্‌ষ্টেন্ ধাতুর সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য ধাতু মিশান হয় এবং সেই মিশ্রিত ধাতু থেকে বাল্‌বের ফিলামেণ্ট তৈরী করা হয়।

এইভাবে ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ আবিষ্কার করা হয় এবং প্রায় ৭০ বছর ধ'রে বহুরকম গবেষণা এবং পরীক্ষার পর আজকালকার বাল্‌ব্ তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে। এই সকল বৈজ্ঞানিকগণ যে শুধু ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার ক'রেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তা' নয়, পরন্তু কি ক'রে এই বাল্‌বের উন্নতি করা যায় সে সম্বন্ধেও তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং এখনও কর্‌ছেন। দোঁকানে গিয়ে আট আনা অথবা দশ আনা পয়সা দিলেই দোকানদার একটি ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ দেয়। সেই বাল্‌ব্‌টি বাড়ী নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে ইলেক্‌ট্রীক্ সুইচ্ (Switch) টিপ্‌লেই দিনের মত আলো হয়। কিন্তু কতদিন ধ'রে কত বৈজ্ঞানিকের সাধ্য-সাধনার ফলে এই ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে তা' খুব কম লোকই জানে।

ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ তৈরী হওয়ার পরে প্রথম প্রথম কিছুদিন দেখা গেল যে, ফিলামেণ্ট অল্প কয়েকদিন জ্বলার পরে তা' থেকে অতি সূক্ষ্ম ধাতুর অংশ বা গুঁড়ো ঝ'রে পড়ে এবং সেই গুঁড়ো কাচের বাল্‌বের ভিতরদিককার গায়ে লেগে যায়। এই রকম হওয়ার ফলে বাল্‌ব্‌ও ক্রমশঃ ময়লা হ'য়ে যায় এবং তা'তে আলোর তেজও ক'মে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন যে, যদি কাচের বাল্‌বের ভিতরের বাতাস পাম্প সাহায্যে বা'র ক'রে দিয়ে বাল্‌বের ভিতরটি একেবারে খালি না রেখে তা'র পরিবর্ত্তে তা'তে নাইট্রোজেন্‌ (Nitrogen) গ্যাস্‌ ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া যায়, তা'হ'লে ফিলামেণ্টের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুঁড়োয় বাল্‌ব্‌ কালো হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নাইট্রোজেন্‌ একটি নিষ্ক্রীয় গ্যাস্‌ অর্থাৎ অক্সিজেন্‌ বা অন্যান্য গ্যাসের মত নাইট্রোজেন্‌ গ্যাস্‌ ধাতুর সংস্পর্শে আস্‌লে তা'দের মধ্যে কোনও রাসায়নিক মিলন হয় না। এইজন্যে বাল্‌বের মধ্যে নাইট্রোজেন্‌ গ্যাস্‌ ভর্ত্তি ক'রে দিলে টাঙ্গ্‌ষ্টেন্‌ধাতু-নির্ম্মিত ফিলামেণ্টের সঙ্গে নাইট্রোজেনের কোনও রাসায়নিক মিলন বা প্রক্রিয়া হ'তে পারে না। আবার বাল্‌ব্‌ যখন জ্বল্‌তে থাকে তখন ফিলামেণ্ট ক্রমশঃ গরম হয় এবং সেই সঙ্গে বাল্‌বের ভিতরের নাইট্রোজেন্‌ গ্যাস্‌ও গরম হয়। এখন, গ্যাসের একটি গুণ হচ্ছে এই যে, গরম

হ'লে উহা ক্রমশঃ উপরদিকে উঠে যায়। বাল্‌বের ভিতরের নাইট্রোজেন্‌ গ্যাস্‌ও গরম হ'লে উপরদিকে উঠ্‌তে থাকে। তা'র ফলে ফিলামেণ্টের গুঁড়োগুলো অত্যন্ত হাল্‌কা ব'লে সেই গরম গ্যাসের সঙ্গে উপরে উঠে বাল্‌বের মাথায় জমে, কাজেই বাল্‌বের নীচেকার কাচ কালো হয় না। এই রকম ব্যবস্থার ফলে বাল্‌ব্‌ থেকে উজ্জ্বল আলো পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

আজকাল নাইট্রোজেনের মত আর্‌গন্‌ (Argon) নামক আর একটি নিষ্ক্রীয় গ্যাস্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গ্যাস্‌টি নাইট্রোজেন্‌ অপেক্ষাও অধিকতর ফলপ্রদ। স্যর উইলিয়ম্‌ র‍্যাম্‌জে (Sir William Ramsay) এই গ্যাস্‌টির আবিষ্কার করেন। আজকাল সকল বাল্‌বেই আর্‌গন্‌ গ্যাস্‌ ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়। তোমরা যখন ইলেক্‌ট্রীক্‌ বাল্‌ব্‌ কিন্‌বে তখন লক্ষ্য কর্‌লে দেখ্‌তে পাবে ঐ বাল্‌বের গায়ে 'গ্যাস্‌ ফিল্‌ড্‌' (Gas Filled—অর্থাৎ গ্যাস্‌পূর্ণ) এই কথা লেখা আছে।

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে ব'লেছি যে, বাল্‌বের ভিতরকার ফিলামেণ্ট যে ধাতুরই হোক্‌ না কেন, ফিলামেণ্টটি বাল্‌বের মধ্যে রেখে তা'র দু'টি মুখ দু'টি সরু প্ল্যাটিনামের তারের সঙ্গে সংযোগ ক'রে দেওয়া হয়। এই প্ল্যাটিনাম্‌ অত্যন্ত মূল্যবান্‌ ধাতু—এমন কি সোনা থেকেও তা'র দাম অনেক বেশী। এইজন্যে আজকাল নিকেল এবং লোহা-মিশ্রিত একরকম বিশেষ

ধাতু ব্যবহার করা হয়। এই মিশ্রিত ধাতুর গুণ প্ল্যাটিনামের মতই এবং এই ধাতু ব্যবহারে প্ল্যাটিনামের মতই ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই মিশ্রিতধাতু-নির্ম্মিত তু'টি সরু তারের সাহায্যে ইলেক্‌ট্রীসিটি একটি সরু কাচের নলের মধ্য দিয়ে বাল্‌বের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফিলামেণ্টের তুই মুখ ঐ সরু তার তু'টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ব'লেই ফিলামেণ্ট জ্বল্‌তে থাকে ও আলো হয়। আজকাল ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌বে যে ফিলামেণ্ট থাকে তা' চুলের চেয়েও সরু—দূর থেকে দেখে মনেই হয় না যে, বাল্‌বের ভিতরে কিছু আছে।

ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব্ সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। একই বাল্‌ব্ সকল রকম ইলেক্‌ট্রীসিটির জন্য ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রীসিটি যদি খুব বেশী শক্তিশালী হয়, তা'হ'লে বাল্‌ব্‌ও সেই রকম শক্তিশালী হওয়া চাই। একটি কম জোরের বাল্‌বের সঙ্গে খুব বেশী শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রীসিটির সংযোগ ক'রে দিলে সেই বাল্‌বের ফিলামেণ্ট একেবারে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। আবার খুব শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রীসিটি সহ্য করতে পারে এই রকম একটি বাল্‌ব্ কম শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রীসিটির সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলে সেই বাল্‌ব্ ঠিকমত জ্বলে না এবং আলোও যথেষ্ট রকম হয় না। ইলেক্‌ট্রীসিটি যে রকম শক্তিশালী হবে বাল্‌ব্‌ও ঠিক

সেই রকম শক্তিশালী হওয়া চাই, তবেই ঠিকমত আলো পাওয়া যাবে। এইজন্যে প্রত্যেক ইলেকট্রীক্ বাল্‌বের গায়ে স্পষ্ট ক'রে লেখা থাকে কি রকম শক্তিশালী ইলেকট্রীসিটিতে সেই বাল্‌ব্‌ জ্বল্‌বে।

ইলেকট্রীক্ হাত-বাতি অথবা টর্চ্চ লাইটের বাল্‌ব্‌ও ঠিক এই উপায়ে প্রস্তুত হয়। আমাদের ঘর-বাড়ী বা রাস্তায় ইলেকট্রীক্ আলো দেওয়ার কাজে যে রকম বাল্‌ব্‌ ব্যবহার করা হয়, টর্চ্চ লাইটের জন্যেও সেই রকম বাল্‌ব্‌ ব্যবহার করা হয়। তবে টর্চ্চ লাইটের বাল্‌ব্‌গুলো সাধারণ ইলেকট্রীক্ বাল্‌বের তুলনায় নিতান্ত ছোট এবং অনেক কম শক্তিশালী। তা'র কারণ টর্চ্চ লাইটে যে ব্যাটারী অথবা ড্রাই-সেল্ (Dry cell) ব্যবহার করা হয়, তা' থেকে যে ইলেকট্রীসিটি উৎপন্ন হয় তা' নিতান্তই কম শক্তিশালী; সুতরাং এই রকম ইলেকট্রীসিটির জন্য শক্তিশালী বাল্‌ব্‌ ব্যবহার ক'রে কোনও লাভ নেই। টর্চ্চ লাইটের বাল্‌বের গায়েও কি রকম শক্তিশালী ইলেকট্রীসিটি ব্যবহার কর্‌লে সেই বাল্‌ব্‌ জ্বল্‌বে তা' লেখা থাকে। তোমরা টর্চ্চ লাইটের বাল্‌ব্‌ কেনার সময় এই লেখা লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌তে পার।

জীয়ান খাদ্য

মাছ-মাংস, তরী-তরকারী, ফল-ফুল প্রভৃতি খাদ্য—যা' আমরা নিত্য খেয়ে থাকি—তা' প্রায় সবই টাট্‌কা। বাসি বা জীয়ান খাদ্য আমরা বড় একটা খাই না। টাট্‌কা খাদ্য-দ্রব্য সকল দিক থেকেই আদর্শ; কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশে বার মাস টাট্‌কা তরকারী, ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি পাওয়া যায় না—আবার যা'-ও বা পাওয়া যায়, তা'তে সব দেশের লোকের বার মাস চলে না।

ইংলণ্ডে সারা বছরে যে খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তা'তে সে-দেশের লোকের কুলোয় না। সেই রকম জার্ম্মেণী, ইটালী প্রভৃতি অনেক দেশ আছে যেখানে মাত্র ছয়, সাত বা আট মাসের খাদ্য জন্মে। সেই সকল দেশের লোকদিগকে বাকী ক' মাসের খাদ্যের জন্যে বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্য-দ্রব্য পাঠাতে অনেক সময় লাগে; ততদিনে ফল, তরকারী সবই প'চে যায়। সুতরাং সেই সকল খাদ্য-দ্রব্য জীয়ান অবস্থায় পাঠান ভিন্ন উপায় নেই। মনে কর, বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট আম অথবা তরমুজ যদি পাঞ্জাবে পাঠান যায় তা'হ'লে সে সমস্তই

ট্রেনে যেতে যেতে নষ্ট হ'য়ে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ঐ আম বা তরমুজ আস্ত না পাঠিয়ে, কেটে জীয়ান অবস্থায় পাঠান যায়, তা'হ'লে বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও তা' ভাল অবস্থাতেই যেতে পার্‌বে। খাদ্য জীয়ান রাখ্‌লে দুর্ভিক্ষের হাত থেকেও অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

খাদ্য জীয়ান রাখার কয়েকটি উপায় আছে। সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি :—

খাদ্য জীয়ান রাখ্‌তে হ'লে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আবশ্যক। ফল বা তরকারীর খোসা ছাড়ান এবং সেগুলো ছোট ক'রে কাটা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ হাতে কর্‌লে অনেক সময় লাগে, তা'তে সেগুলো একেবারে প'চে যেতে পারে। একজন পাকা ওস্তাদ কসাই যতক্ষণে একটি মুরগী কেটে, পালক ছাড়িয়ে তা'র মাংস তৈরী কর্‌তে পারে, আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে সেই সময়ে তা'র দশগুণ কাজ হয়। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে শত শত পীচ্‌ফল খোসা ছাড়িয়ে, দু'টুক্‌রো ক'রে বোতলে ভর্ত্তি করা যায়। এই কাজের জন্যে আজকাল নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হয়েছে। আনারস জীয়ান রাখ্‌তে হ'লে যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তা'দের নাম 'গিনাকা' (Ginaca)। আনারসের খোসা ছাড়িয়ে, তা'র মধ্যেকার চোখ বাদ দিয়ে,

খাওয়ার উপযোগী কর্তে অনেক সময় লাগে, কিন্তু এই গিনাকা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে একশ' আনারস—খোসা ছাড়ান থেকে চাকা চাকা ক'রে কাটা পর্য্যন্ত সকল কাজই হয়। এই সকল নানাপ্রকার ফলের জন্যে নানারকমের যন্ত্রপাতি আছে।

কোনও কোনও ফল কাটার পরে হাতে টিনের কৌটায় ভর্ত্তি করা হয়; কিন্তু মটর বা সীমের বীজের মত জিনিস একটি প্রকাণ্ড পাত্রে রাখা হয়—তা' থেকে পাইপ্ বা নলের সাহায্যে সেগুলো আপনিই কৌটায় ভর্ত্তি হ'য়ে যায়। তখন অন্য একটি পাত্র থেকে পাইপের সাহায্যে এক রকম সিরাপের মত পদার্থ এসে কৌটাগুলো ভর্ত্তি ক'রে দেয়। পরে কৌটাগুলো কুকার্ (Cooker) অথবা রান্না করার যন্ত্রে পাঠান হয়। সেখানে সময় ও টেম্পারেচার্ (Temperature) বা উত্তাপ অতি সাবধানে মাপা হয় এবং ঠিক যত সময় ও যতখানি উত্তাপ প্রয়োজন, ঠিক তত সময় সেখানে রেখে ততখানি উত্তাপ দেওয়া হয়। একটু বেশী বা কম উত্তাপ দিলে জীয়ান খাদ্য অব্যবহার্য্য হয়। কৌটাগুলো এই রকমে গরম করাতে তা'দের ভিতরকার তরকারী রান্না হ'য়ে যায় এবং তা'দের ভিতরকার বাতাসও বাইরে চ'লে যায়। তখন কৌটাগুলোতে যন্ত্রের সাহায্যে এ রকম ভাবে ঢাক্না

লাগিয়ে দেওয়া হয় যে, ওদের মধ্যে বাইরের বাতাস প্রবেশ কর্‌তে পারে না।

ফল জীয়ান রাখ্‌তে হ'লে রান্নার প্রয়োজন নেই। ফল কাটা হ'লে টিনের কৌটায় ভর্ত্তি ক'রে, তা'র মধ্যে সিরাপ ঢেলে দেওয়া হয় এবং অন্ততঃ পনের মিনিট টিনগুলো গরম করা হয়—যা'তে ভিতরের বাতাস একেবারে বা'র হ'য়ে যায়। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে ঢাক্‌নী লাগিয়ে তাড়াতাড়ি জলে রেখে ঠাণ্ডা করা, ধোওয়া ও শুকান হয়; পরে লেবেল্‌ দিয়ে বাক্সে বোঝাই করা হয়। এই সকল কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়।

ফল, তরকারী অথবা মাছ-মাংস জীয়ান রাখ্‌তে হ'লে তা' উৎকৃষ্ট হওয়া চাই, কারণ মাত্র একটি পচা দ্রব্যের জন্য সমস্ত খারাপ হ'য়ে যেতে পারে। অনেকের ধারণা যে, জীয়ান খাদ্যের জন্য যত পরিত্যক্ত, পচা অথবা দাগী ফল বা তরকারী প্রভৃতিই নেওয়া হয়; কিন্তু তা' ভুল। কেননা পচা বা দাগী দ্রব্য যত যত্ন ক'রেই রাখা যাক্‌ না কেন, তা' বেশীদিন জীয়ান রাখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, জীয়ান খাদ্য টাট্‌কা খাদ্যের তুলনায় কম পুষ্টিকর। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ নানারকম পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, 'ভিটামিন্‌' (Vitamin) অথবা জীবনী-

শক্তি—টাট্‌কা তরকারী, ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতিতে যতখানি আছে, জীয়ান খাদ্যেও ঠিক ততখানিই আছে। কিন্তু তাই ব'লে টাট্‌কা খাদ্য পেলে আর জীয়ান খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

টিনের কৌটায় এই রকমে খাদ্য জীয়ান রাখার প্রণালীকে ফুড্-ক্যানিং (Food Canning) বলা হয়। ফুড্ (Food) মানে খাদ্য, আর টিনের ছোট কৌটাগুলোর নাম ক্যান্ (Can) ; অতএব ফুড্-ক্যানিং কথাটির অর্থ—টিনের কৌটাতে খাদ্য রাখা। ফুড্-ক্যানিংএর বহুল প্রচলন খুব বেশীদিন হয় নি। মাত্র দু'তিন বছর আগে পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে পীচ্ ও আনারস জাতীয় কয়েকটি ফল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য জীয়ান রাখা হ'ত না। এখন প্রায় সব রকম ফল ও খাদ্যই জীয়ান রাখা হচ্ছে।

ফুড্-ক্যানিংএর প্রচলন হওয়াতে এখন বছরের যে কোনও সময়েই যে কোনও রকম খাদ্য খাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ফল গ্রীষ্মকালেই পাওয়া যায় ; কুল, পেয়ারা, কমলালেবু প্রভৃতি ফল শীতকালে মিলে ; বাঁধাকপি, ফুলকপি, বীট্-পালং প্রভৃতিও শীতকালেই পাওয়া যায় ; আবার উৎকৃষ্ট এবং সুস্বাদু ইলিশ মাছ বর্ষাকালেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন ফুড্-ক্যানিং এবং জীয়ান খাদ্যের কল্যাণে বছরের যে কোন সময়েই এই সকল নানারকমের

খাদ্য খাওয়া যেতে পারে। এখন আর পূর্ব্বেকার মত ঋতু-পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় থাকতে হয় না।

প্রতি বছরই জীয়ান খাদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার একটি দোকানে ৬০ রকম তরকারী, ৪৫ রকম ফল, ৩৭ রকম মাছ, ৪০ রকম সুপ্ (Soup) বা সুরুয়া, ২৭ রকমের মাংস এবং ৩০ রকমের অন্যান্য খাদ্য এখন পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন কোনও হোটেল বা খাবারের দোকান নেই যেখানে একসঙ্গে এত রকমের খাদ্য পাওয়া যেতে পারে।

ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যে পরিমাণ জীয়ান খাদ্য ব্যবহৃত এবং বিক্রয় করা হয়, পৃথিবীর আর কোনও দেশে তত হয় না। ঐ দেশে প্রায় প্রতি বাড়ী, হোটেল বা খাবারের দোকানে প্রত্যহ শত শত লোক নানারকম জীয়ান খাদ্য খাচ্ছে। আমাদের দেশে উহার প্রচলন এখনও হয় নি—হয়তো হবেও না। কারণ আমাদের দেশে প্রচুর টাট্‌কা খাদ্য পাওয়া যায় এবং আমাদিগকে খাদ্যের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতেও হয় না।

ফুড্-ক্যানিং ভিন্ন অন্য উপায়েও খাদ্য জীয়ান রাখা যায় এবং সেই সকল প্রণালী ফুড্-ক্যানিং থেকে অনেক সহজ। কিন্তু ফুড্-ক্যানিং করলে খাদ্য যতদিন জীয়ান থাকে, অন্য যে কোনও প্রণালীতে তত দিন জীয়ান থাকে না।

অন্য কি কি প্রণালীতে খাদ্য জীয়ান রাখা যায় বল্‌ছি। খাদ্য গরম কর্‌লে অথবা তা'তে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দিলে সেই খাদ্যে কোনও কীটাণু প্রবেশ কর্‌তে পারে না। আবার জলের অভাবে এই সকল কীটাণু বাঁচ্‌তে পারে না; সুতরাং খাদ্যের ভিতরের জলীয় ভাগ দূর ক'রে দিলে সেই খাদ্যে কীটাণু থাক্‌তে পারে না। তেমনি আবার বরফের মত ঠাণ্ডা অবস্থাতেও খাদ্যে কীটাণু প্রবেশ কর্‌তে অথবা বাঁচ্‌তে পারে না।

খাদ্য রৌদ্রে শুকিয়ে তা'র ভিতরকার জলীয় ভাগ দূর ক'রে দিলে সেই খাদ্য বহুদিন পর্য্যন্ত জীয়ান রাখা যায়। এইভাবে সাধারণতঃ ফলই জীয়ান রাখা হয়। আঙ্গুর, আখ্‌রোট্‌, বাদাম প্রভৃতি বহুদিন রৌদ্রে শুকালে ক্রমশঃ তাদের মধ্যেকার জলীয় ভাগ বা'র হ'য়ে যায় এবং ঐ সকল ফল শুকিয়ে ক্রমশঃ আকারেও অনেক ছোট হয়। এই অবস্থায় ফলগুলোকে অনেকদিন রাখা যায়। যখন প্রয়োজন হয় তখন জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখ্‌লে তা'রা আবার তাদের পূর্ব্বেকার আকার এবং স্বাদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রেছ—কিস্‌মিস্‌ বা মনেক্কা খাওয়ার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এই কিস্‌মিস্‌ বা মনেক্কা শুষ্ক আঙ্গুর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

খাদ্যে লবণ বা অন্য কোনও রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে রাখ্‌লে সেই খাদ্য দীর্ঘকাল জীয়ান থাকে। কাঁচা মাংসে লবণ দিয়ে রাখ্‌লে সেই মাংস অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। আম, পেয়ারা প্রভৃতি থেকে জেলী করা হয়। জেলীতে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি দিয়ে রাখ্‌লে তা' বহুদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে—সেইটি হচ্ছে, চিনির রস পাতলা হ'লে জেলীতে কীটাণু প্রবেশ কর্‌তে পারে, কিন্তু গাঢ় চিনির রসে তৈরী কর্‌লে তা'তে কীটাণু প্রবেশ কর্‌তে পারে না।

খাদ্য যদি বরফ দিয়ে বেশ ভাল ক'রে ঢেকে রাখা যায় তা'হ'লে অত ঠাণ্ডাতে কোনও প্রকার কীটাণু প্রবেশ কর্‌তে অথবা বাঁচ্‌তে পারে না। আমাদের দেশে এক স্থান হ'তে আর এক স্থানে মাছ চালান দেওয়ার সময়ে, বড় বড় কাঠের বাক্সে মাছ ভাল ক'রে বরফ দিয়ে ঢেকে তবে পাঠান হয়। এই রকম ক'রে না পাঠালে মাছ শীঘ্রই পচ্‌তে আরম্ভ করে।

এখন পর্য্যন্তও আমাদের দেশে ফুড্‌-ক্যানিং প্রণালীতে খাদ্য জীয়ান রাখা হয় নি বটে; কিন্তু বাকী কয় প্রণালীতে খাদ্য জীয়ান রাখার প্রথা বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে।

ব্যাকালাইট্

তোমরা খুব সম্ভবতঃ ইবোনাইট্ (Ebonite) দেখ নি এবং অনেকে হয়তো তা'র নাম পর্য্যন্তও শোন নি। ইবোনাইট্ এক রকম কুচ্‌কুচে কালো এবং শক্ত কাঠ। ইবোনাইট্ প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইবোনাইট্ অত্যন্ত দামী কাঠ ব'লে আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক রকম ইবোনাইট্ প্রস্তুত করা হচ্ছে—তা'র নাম ব্যাকালাইট্ (Bakelite)।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অন্তর্গত বেল্‌জিয়ম্ (Belgium) দেশের একজন বৈজ্ঞানিক ব্যাকালাইট্ প্রস্তুত করেন এবং তাঁ'রই নামানুসারে এই জিনিসটির নাম ব্যাকালাইট্ রাখা হয়েছে। ব্যাকালাইট্ কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

দু'টি বর্ণহীন তরল পদার্থ একত্রে মিশিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী কঠিন পদার্থে পরিণত করতে পারা যায়—এই রকম ব্যাপার শুনে প্রথমতঃ খুবই আশ্চর্য্যজনক ব'লে মনে হয়। কিন্তু ব্যাকালাইটের বেলায় এই ব্যাপার একেবারেই ঠিক এবং এইভাবেই ব্যাকালাইট্ প্রস্তুত হয়। কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিডের নাম

তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান এবং অনেকে হয়তো কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিড্ দেখেছও। ঘা, পাঁচ্ড়া হ'লে কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিড্যুক্ত সাবানে ঘা ধুইয়ে দেওয়া হয় তা'ও খুব সম্ভবতঃ তোমরা জান্। সেই কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিড্ এবং ফর্ম্যাল্ডিহাইড্ (Formaldehyde) নামক আর একটি তরল রাসায়নিক জিনিস একত্রে লোহার এক রকম পাত্রে অনেকক্ষণ ধ'রে গরম করা হয়। এই ছু'টি তরল পদার্থ একত্রে মিশিয়ে গরম কর্লে বিশেষ কিছুই হয় না ; কিন্তু যদি গরম করার পূর্ব্বে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া (Ammonia) নামক আর একটি রাসায়নিক পদার্থ ঢেলে দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঐ ছু'টি তরল পদার্থ কিছুক্ষণ গরম করার পরে আশ্চর্য্য-জনক পরিবর্ত্তন ঘটে। ঐ মিশ্রিত পদার্থ হঠাৎ গেঁজিয়ে ওঠে এবং পরে ছু'টি স্তরে বিভক্ত হ'য়ে পাত্রের মধ্যে ব'সে যায়। এই ছু'টি স্তরের মধ্যে একটির রং হল্দে এবং অপরটি বর্ণহীন। ঐ বর্ণহীন স্তরটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়—হল্দে রঙের স্তরটি জলের স্তর হ'তে আলাদা ক'রে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'তে দিলে ক্রমশঃ একরকম চট্চটে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই চট্চটে পদার্থটি গাছ থেকে যে স্বাভাবিক "রজন" অথবা আঠাজাতীয় জিনিস ব্বা'র হয় তা'রই মত দেখ্তে এবং এই পদার্থটির গুণাবলীও রজনেরই মত।

অতঃপর ঐ চট্‌চটে পদার্থের সঙ্গে খুব মিহি করাতের গুঁড়ো এবং প্রয়োজনমত রং করার ঔষধপত্র মিশিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে গরম করা হয়। এই সময়ে ঐ সকল দ্রব্যাদি একটি বিরাট যন্ত্রের সাহায্যে অনবরত চূর্ণ এবং মিশ্রিত হ'তে থাকে। এই রকম করাতে ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে আর একটি রাসায়নিক মিলন ঘটে, যা'র ফলে একটি কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়—এই কঠিন পদার্থটি আগুনে গরম কর্‌লে নরম হয় এবং এইটিই হচ্ছে ব্যাকালাইট্‌। এই কঠিন পদার্থটিকে খুব মিহি ক'রে গুঁড়ো করা হয় এবং এই গুঁড়ো হ'তেই নানাপ্রকার ছাঁচের সাহায্যে প্রয়োজনমত আকারের জিনিসপত্র তৈরী করা হয়।

ব্যাকালাইট্‌-গুঁড়ো থেকে নানারকম আকারের জিনিসপত্র তৈরী করা এক কৌশলের ব্যাপার এবং তা'তে বহু প্রকার ছাঁচের প্রয়োজন হয়। এই সকল ছাঁচ ইস্পাতের তৈরী এবং দেখ্‌তে বিরাট। তা'দের ভিতরের দিক্‌ খুবই উজ্জ্বল এবং ভিতরের দিকে ক্রোমিয়াম্‌ নামক একটি বিশেষ ধাতুর আবরণ দেওয়া থাকে, যা'তে ক'রে তা'দের সাহায্যে যে সকল জিনিস প্রস্তুত হবে তা'দের গা খুবই মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়। ব্যাকালাইটের গুঁড়ো এবং তেল যে রকম ইচ্ছা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে খুব জোরে চাপ দেওয়া হয়। সেই

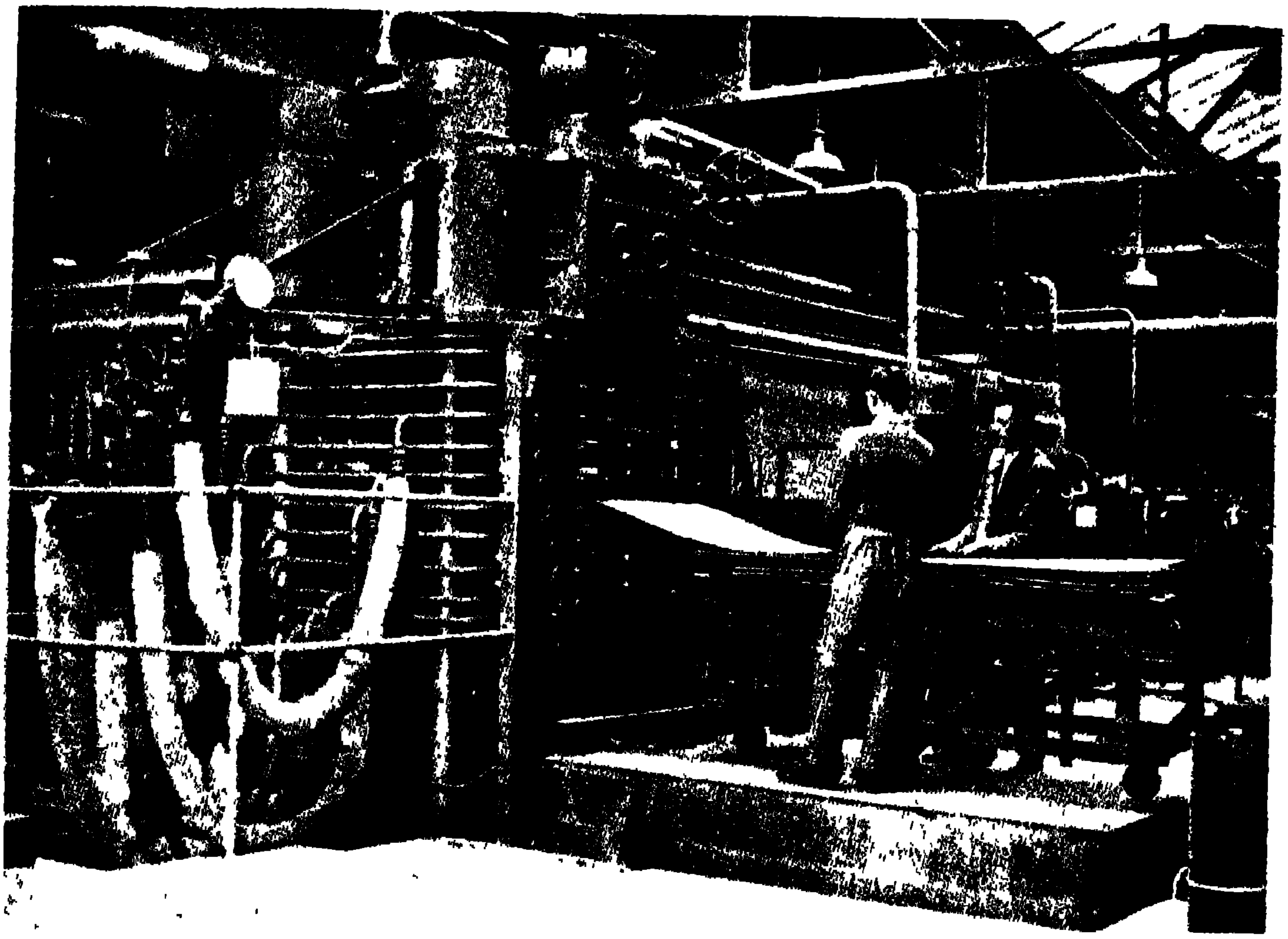

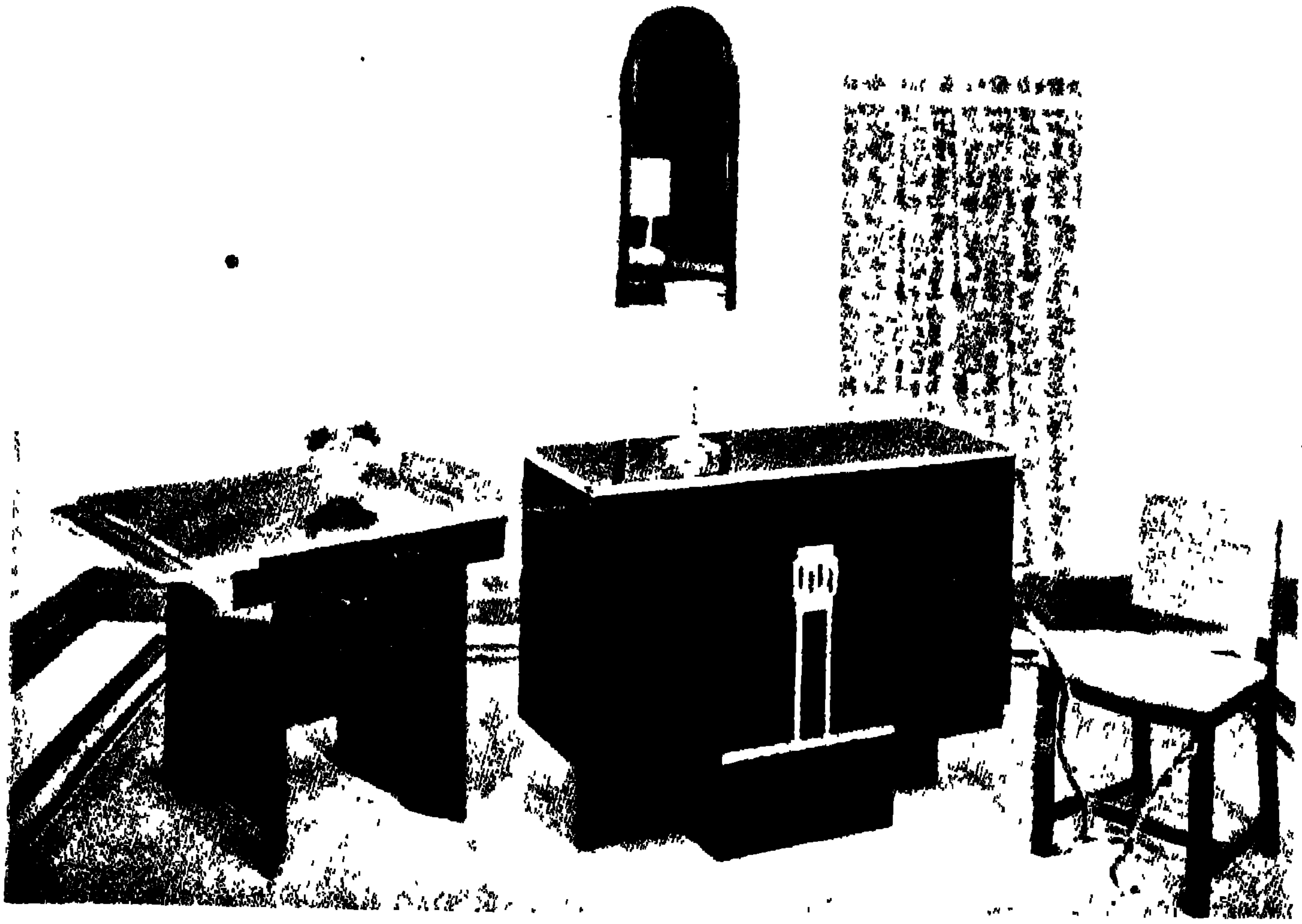

(উপরে) ব্যাকালাইট্

(নীচে) ব্যাকালাইটে প্রস্তুত টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি

সময়ে ছাঁচগুলো ইলেক্ট্রীক্ অথবা গ্যাসের আগুনে গরম রাখা হয়। কিছুক্ষণ এইভাবে চাপ দেওয়ার পরে ছাঁচগুলো ঠাণ্ডা হ'লে খুলে ফেলা হয় এবং তখন ঠিক সেই সকল ছাঁচের আকার মত ব্যাকালাইটে প্রস্তুত নানারকম জিনিস বা'র হ'য়ে পড়ে। আবার, যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে ব্যাকালাইটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত অথবা চাদরও প্রস্তুত করা যায়।

ব্যাকালাইটে প্রস্তুত জিনিসপত্র দেখ্‌তে খুবই উজ্জ্বল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তা'র ওপরকার পালিশ নষ্ট হয় না। এই সকল জিনিস এলুমিনিয়মের মত হাল্কা, কিন্তু খুব শক্ত—সহজে ভাঙ্গে না। ব্যাকালাইটের জিনিস অন্য অনেক জিনিসের মত জল কিংবা অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থে গ'লে যায় না বা নষ্ট হয় না। তা'দের ওপরকার পালিশ অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে ব'লে সহজে ময়লা পড়ে না। ব্যাকালাইটের আর একটি গুণ এই যে, উহাতে ইচ্ছামত রং করা যায়। ব্যাকালাইট্ যখন চট্‌চটে অবস্থায় থাকে, তখন তা'তে রাসায়নিক জিনিস মিশিয়ে হল্‌দে, লাল, নীল, সবুজ, শাদা প্রভৃতি রং করা যায়—ইবোনাইটের মত ব্যাকালাইটের নিজস্ব কোনও রং নেই। ব্যাকালাইটের জিনিসপত্রে পোকা লাগে না, গরম বা ঠাণ্ডাতে সেগুলো মোটেই নষ্ট হয় না এবং আগুনেও পুড়ে যায় না। এইজন্য ঐ সকল জিনিসপত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

ব্যাকালাইট্ এত শক্ত যে, আজকাল কোনও কোনও যন্ত্রপাতির বিশেষ বিশেষ অংশ ব্যাকালাইটে প্রস্তুত করা হয়; উহাতে শব্দও কম হয়।

এতগুলো গুণ থাকার জন্যে আজকাল অনেকরকম জিনিসই ব্যাকালাইট্ থেকে তৈরী হচ্ছে। ইলেক্ট্রীক্ এবং রেডিওর প্রায় সকল যন্ত্রপাতিই ব্যাকালাইটে প্রস্তুত করা হয়। তা'ছাড়া সাবানের বাক্স, ফুলদানী, দোয়াত, সিগারেটের ছাই ফেলার ট্রে, আঠার পাত্র, ফাউণ্টেন পেন, দরজার হাতল, মাথার চিরুণী প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্যাদি তৈরী হয়। আবার, জল কিংবা রাসায়নিক জিনিসের সংস্পর্শে গ'লে যায় না অথবা নষ্ট হয় না ব'লে আজকাল চায়ের পেয়ালা, ছোট রেকাব, গেলাস, চামচ, এমন কি ছুরী-কাঁটা পর্য্যন্তও ব্যাকালাইটে প্রস্তুত হচ্ছে। ব্যাকালাইটের টেবিল, চেয়ারও আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়; উহা দামেও বেশ সস্তা। ব্যাকালাইট্ থেকে যে কত রকম ও কি পরিমাণ জিনিস তৈরী হ'তে পারে তা'র ইয়ত্তা নেই এবং ব্যাকালাইট্-শিল্প এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এটিকে বর্ত্তমান যুগের রসায়নশাস্ত্রের একটি রহস্য ব'লে মনে হয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বাস করার ঘর-বাড়ীর মেঝে, ছাদ, দরজা, জানালা প্রভৃতিও ব্যাকালাইটে প্রস্তুত হবে।

ব্যাকালাইট্

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে ব'লেছি যে, ব্যাকালাইট্ প্রস্তুত করতে হ'লে কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিডের প্রয়োজন। কার্ব্বোলিক্ অ্যাসিড্ আল্‌কাত্‌রা থেকে পাওয়া যায়; আবার, আল্‌কাত্‌রা পাওয়া যায় কয়লা থেকে। সুতরাং যে সকল দেশে কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে ব্যাকালাইট্ প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এইজন্যে ইউরোপ এবং আমেরিকার যে সকল দেশে কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে ব্যাকালাইট্ বহু পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। একমাত্র ইংলণ্ডেই প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে।

আমাদের ভারতবর্ষেও কয়লা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও ব্যাকালাইট্ প্রস্তুত করার ফ্যাক্টরী বা শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতবর্ষে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাকালাইট্ বিদেশ থেকেই আসে।

শেষ